চিহ্নতত্ত্বের আলোকে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য

পিএইচ.ডি. (কলা) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য
প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক
দিব্যেন্দু দলুই
A00BE1201316
2016-17

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সৌমিত্র বসু
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০০৩

গবেষণাপত্রের শিরোনাম ও অধ্যায়ভাবনা

শিরোনাম:

চিহ্নতত্ত্বের আলোকে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য

অধ্যায়-ভাবনা:

প্রথম অধ্যায়— চিহ্নের তাত্ত্বিক কাঠামোয় ব্যঞ্জনার শ্রেণিবিন্যাসগত ব্যাকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়— কথাসাহিত্যের জন্ম থেকে আধুনিকতা : চিহ্নচেতনার সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তন

তৃতীয় অধ্যায়— বাংলা কথাসাহিত্যের চিহ্নকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

উপসংহার:

গ্রন্থপঞ্জি:

ভূমিকা

চিহ্ন ও চেনা— এই দুটি বিষয় ধ্বনিগতভাবে অনেকখানিই ঘনিষ্ঠ, বলা চলে। চিন্তনও তা-ই। কিন্তু শুধু ধ্বনিগত বা উচ্চারণগতভাবেই নয়, এদের মধ্যে কোথাও যেন এক প্রচ্ছন্ন দার্শনিক যোগও পরিলক্ষিত হয়। কাকে চিনব? কাকে চিনছি? চারপাশের পৃথিবীকে? আর নিজের মনের জগতটিকেও বুঝি! গাছ থেকে শুরু করে গতিসূত্র, মাছ থেকে শুরু করে মতিভ্রম, কাছ থেকে শুরু করে দূরবর্তী টিলা, সবকিছুই তো আমরা পৃথকভাবে কোনো-না-কোনো উপায়ে চিনতে শিখছি ছোটোবেলা থেকে বা চিনতে থাকবও বুড়োবয়স অবধি। এই চেনার পিছনে যে চিন্তন, তা-ই কি আসলে চিহ্ন নয়? কিন্তু এই চেনা কি অতই সহজ বিষয়, যতখানি সহজ আমরা ভাবি? আর এই 'চেনা'র ভিতর রয়েছে যে 'বোঝা', তার বোঝাও কি যথেষ্ট ভারবহুল নয়? 'শুক' বললে আমরা না-হয় সবাই টিয়াপাখি বুঝলাম, কিন্তু 'সুখ' বললে আমরা কী বুঝব? তবে কি আপেক্ষিকতা এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে 'চেনা-বোঝা'র চেহারা? এমনকি 'শুক' বললেও সবার মনে যে টিয়াপাখির ছবি ভেসে উঠবে, তাও দেখতে সদৃশ হলেও কার্যত একটিই পাখি নয়। অভিজ্ঞতার তারতম্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য সেখানেও থেকেই যাবে। আর কারো চোখে যদি চন্দনা পাখি বসে থাকে? আর উল্টোদিকে সুখের যে বৈচিত্র্য জোগাড় হবে, তা নিয়ে কিছু না-বলাই আপাতত ভালো। আলাদা আলাদা মানুষের আলাদা আলাদা মতি; তাই 'মত'ও নানা মুনির নানা রকম। কিন্তু 'মুনি' মানে তো 'মৌনী', তা-হলে তাঁদের মতামতটুকু প্রকাশ পাবে কী করে? মতপ্রকাশের মূল মাধ্যম তো ভাষা, মৌখিক ভাষা। লিখে বোঝাবেন কি? সেক্ষেত্রেও মৌখিক ভাষার বিকল্প হিসেবে নতুন কোনো চেনার উপায়ের প্রয়োজন— অর্থাৎ লিপির প্রয়োজন। অথবা ধ্বনি ও লিপি— এই দুয়ের কোনোটিরই সাহায্য না নিয়ে মতপ্রকাশ করতে চাইলে আরও অন্য কোনো ভাবভঙ্গিমার প্রয়োজন। এবার ধরা যাক, যাঁরা মুনি নন, এবং যাঁরা একই সমাজব্যবস্থা ও মাতৃভাষাগোষ্ঠীর অংশ, তাদের ক্ষেত্রে কি এই চেনাবোঝার বিষয়গুলি সহজ হবে? হ্যাঁ, সহজ নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সুনিশ্চিত হবে কি? সেখানেও ভাষা, ভঙ্গি, যে বলছে, যে শুনছে, প্রেক্ষিত বা পরিস্থিতি, সবকিছু মিলে এক জটিল বহুমাত্রিকতা তৈরি করবেই। ক্লাস এইটের একটি ছেলেকে যখন দিদিমণি দেখে বলেন 'বাড়ন্ত বাচ্ছা', তখন তার মন এই ভেবে খুশি হয় যে সেও বাড়তে বাড়তে শিগগির বড়োদের মতো হয়ে উঠবে; কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন

ঠাকুমা-র মুখে শোনে ‘চাল বাড়ন্ত’ আর সে চালের ডাব্বায় উঁকি দিয়ে দেখে, চালের পরিমাণ শেষ দু-দিনে পাত্রের আধভাগ থেকে কমে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, তখন সে মায়ের কথার মানে বুঝতে গিয়ে একটু ধন্দে পড়ে যেন। অথচ নেহাত সে যে অবুঝ, তাও নয়। মা যখন রাগী-রাগী মুখে চোয়াল শক্ত করে বলে, “দাঁড়াও, খেলতে যাওয়াচ্ছি তোমায়!”— সে তখন দিব্যি বোঝে যে সেই মূহূর্তে তার খেলার সাধটুকু কতখানি দুর্গম হয়ে উঠতে চলেছে। কিংবা ‘আজ ভারতের ম্যাচ আছে’ বললে সে ভারতের ক্রিকেট-দলের খেলাই বোঝে, কোনোরকম মাথার কসরৎ ছাড়াই। কিংবা সিঁড়িতে খটখট শব্দ পেলে সে বোঝে, বুট পরে কেউ ওপরে উঠে আসছে, এমনকি তখন ঘড়িতে সন্ধে আটটা বাজলে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে সে এও বোঝে যে, আর কেউ নয়, তার বাবাই অফিস থেকে ফিরছে। আবার সিরিয়াল বা সিনেমায় যখন কেউ বলে ‘আইনের হাত অনেক লম্বা’, সে ভাবে— ‘কত লম্বা’, ‘সেই রাক্ষুসির গল্পে রাক্ষুসিটা যেমন দাওয়ায় বসে হাতটা অনেকখানি লম্বা করে পাতিলেবু পাড়ছিল, সেইরকম লম্বা কি?’ অথবা পাড়ার মোড়ে যাদবকাকার চায়ের গুমটি ভেঙে সেখানে মুখার্জিদের মোবাইলের দোকান বসে গেলে, যাদবকাকা যখন থানায় নালিশ জানিয়েও কোনো ফল পায় না, আর লোকে বলে, “এর পেছনে MLA-রও হাত আছে”, তখন কি ছেলেটা ভাবে, ‘MLA-এর বাড়ি তো অনেক দূরে, তাহলে MLA-এর হাত আরও কত লম্বা’? কিংবা মুদিখানার দোকানে ভোটের ফলাফল নিয়ে কথা হলে কেউ যখন শ্বশুরবাড়ির এলাকার খবর জানানোর জন্য বলে, “ওদিকে তো গোরুতে সব ঘাস মুড়ো করে খেয়ে নিয়েছে”, তখন সে কি অবাক হয়? নাকি আর পাঁচজনের হাসিতে সেও না বুঝে যোগ দিয়ে ফেলে? এ তো গেল আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষার সংকট। আর সাহিত্য? সাহিত্যের ভাষাকে চেনার প্রক্রিয়াটি ঠিক কীরকম? সাহিত্য মানে তো সহিতত্ব। অর্থাৎ সংযোগ বা মিলনও বলা যায়। কীসের সঙ্গে কীসের মেলামেশা? যা বলা বা লেখা হয়েছে, আর যা শোনা বা পড়া হয়েছে— এই দুয়ের? বলা আর শোনার মধ্যে, লেখা আর পড়ার মধ্যে যে চেনা বা বোঝার প্রক্রিয়া, তা-ই তো এই দুয়ের মিলন। অর্থাৎ চেনার প্রক্রিয়াই কি সাহিত্য? অর্থাৎ চিহ্নই সাহিত্য? তা-হলে আমাদের রোজকার ব্যবহারিক ভাষাতেও তো চিহ্ন তথা চেনার প্রক্রিয়াটুকু জ্যান্ত রয়েছে, তাকে কেন আমরা সাহিত্য বলি না। সম্ভবত সহিতত্বের মাত্রা ও গভীরতার কথাই বলা হবে। তা হোক, সেই তর্কে না গিয়ে আমরা আপাতত বোঝার চেষ্টা করি, সাহিত্যে বা সমাজে এই চেনাচেনির তথা

চিহ্নায়নের চরিত্র কেমন। এইসূত্রে আবার আসবে চিন্তনের কথা। ‘চিন্তন’ কী? জটিল প্রশ্ন। বহু লোক তা নিয়ে ভেবেছেন। অর্থাৎ ‘চিন্তা’ নিয়েও চিন্তা করেছে মানুষ। যেমন চেনাচেনির চরিত্র চিনতে চাইছি আমরা। এই চেনার প্রক্রিয়া নিয়ে অর্থাৎ ‘চিহ্ন’ নিয়েও চিন্তা করেছেন বহু চিন্তক। প্রশ্ন হল: কারা আর কেমন ক’রে? তাঁদের সেই প্রস্তাবিত চেনার পদ্ধতিগুলির সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ঠিক কতখানি? বিশেষত কথাসাহিত্যের মতো একটি সুপ্রচলিত সাহিত্যধারার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রকারভেদ কীরকম? বাংলা কথাসাহিত্যের চালচিত্র যদি কেউ চিনতে চান, তিনিই-বা কীভাবে চিনবেন? কোনো একটি আখ্যানের নিবিড় পাঠ তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে নিতে চাইবেন, কোন্ চরিত্রকে শনাক্ত করতে চাইবেন কোন্ চশমায়? আমিই-বা বিষয়টিকে কী চোখে চিনতে চাইছি? ‘শুক’ বলতে আমিও কি টিয়াপাখিই বুঝছি? নাকি আমারও চোখের কোটরে চুপি চুপি চন্দনা ঢুকে বসে আছে? এইসব যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরও একরকম (অথবা অনেকরকম) করে খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা, পরোক্ষভাবে চিনে নিতে চেয়েছি নিজেরই নিহিত চেতনার চলাচল।

প্রথম অধ্যায়

চিহ্নের তাত্ত্বিক কাঠামোয় ব্যঞ্জনার শ্রেণিবিন্যাসগত ব্যাকরণ

চিহ্নতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলিকে এই স্বল্প পরিসরে যথাযথভাবে জ্ঞাপন করা যথেষ্ট দুঃসাধ্য যেহেতু, তাই আমরা শুরুতেই আমাদের সন্দর্ভের মূল তাত্ত্বিক অভিপ্রায় ও অবলম্বনটুকু সংক্ষিপ্তসাররূপে পেশ করতে চাইছি। সুইস ভাষাতত্ত্ববিদ ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুরের (১৮৫৭-১৯১৩) সম্পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নসংক্রান্ত ধারণাটিকে (*Course in General Linguistics*, ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত) পরবর্তীকালে রঁল্যা বার্ত (১৯৫৭ সালে তাঁর *Mythologies* বইটির 'Myth Today' অংশে) যেভাবে সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় মুক্তি দিলেন, তাকে ভিত্তিভূমি হিসাবে ধরেও আমরা এক্ষেত্রে পাদপীঠ হিসেবে গ্রহণ করেছি, চার্লস স্যান্ডারস পার্স (চিহ্নবিজ্ঞানের আমেরিকান ঘরানার অন্যতম মধ্যমণি) চিহ্নের যে বর্গীকরণ করেছেন, তার কাঠামোটিকে। এখানে গোটা বিষয়টিকে ছোটো ছোটো কয়েকটি ক্রমে বিন্যস্ত করলে দাঁড়ায়—

১. স্যসুরের চিহ্নসংক্রান্ত মডেলটি একটি দ্বিতল কাঠামোর উপর গঠিত। চিহ্ন(sign)-কে তিনি Signifier ও Signified-এর যোগফল হিসাবে দেখেছেন। স্যসুরের মতে, the signifier (the 'sound pattern') ও the signified (the 'concept')— দুটোই পুরোপুরি 'psychological'; অর্থাৎ signifier (চিহ্নায়ক) হল ধ্বনির মনস্তাত্ত্বিক অবয়ব এবং সেটি যাকে নির্দেশ করছে তাও সরাসরি সেই বস্তুটি (স্যসুর যাকে বলছেন 'referent') নয়, বরং বস্তুটির একটি ধারণা। অর্থাৎ 'গাছ' ধ্বনিটি (ধ্বনিটির মনস্তাত্ত্বিক অবয়বটি) বাস্তব কোনো গাছকে (referent) প্রকাশ করছে না, প্রকাশ করছে গাছের একটা সাধারণ ধারণাকে যা আমাদের মস্তিষ্কে ছবি আকারে উপস্থিত। এইভাবে দেখলে, লিখিত পাঠের ক্ষেত্রে স্যসুরের মডেলটিকে গ্রহণ করলে তা একটি ত্রিতলবিশিষ্ট মডেলে পরিণত হয়।

২. স্যসুরের এই মডেলটি পরবর্তীতে সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের পাঠ নেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে উঠেছে ফরাসী তাত্ত্বিক রোলাঁ বার্ত-এর (১৯১৫-১৯৮০) হাত ধরে। তাঁর *Mythologies* (1957) বইটির 'Myth Today' অংশে স্যসুরের মডেলটিকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে তিনি চিহ্নের গঠনতাত্ত্বিক আলোচনায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ককে আরও এক/একাধিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করে তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে একটি Signifier ও Signified–এর মধ্যে গড়ে ওঠা Sign (যাকে বলা চলে denotation বা আক্ষরিক অর্থ) চিহ্নায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি Signifier হয়ে নতুন Signified–কে প্রকাশ করে (যাকে বলতে পারি connotation বা অভিপ্রেত অর্থ)। অর্থাৎ এই

পদ্ধতিতে একটি শান্ত ছায়ানিবিড় গাছতলাও বিশেষ প্রেক্ষিতে বন্ধুত্ব কিংবা আতিথেয়তার দ্যোতক হয়ে ওঠে।

৩. আরও একটি বিষয় সম্পর্কে স্যসুর আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন, সেটি হল— স্যসুর চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ককেই মূলত চিহ্ন বলেছেন, কিন্তু এই চিহ্নের মূল্য ('value') নির্ভর করে পুরোপুরি 'context'-এর উপর। Context-এর বাইরে চিহ্নের কোনো চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় মূল্য নেই। স্যসুর দাবার ঘুঁটির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। একই signifier ও signified-এর তাৎপর্য context অনুযায়ী আলাদা। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, 'সিন্দুক' এই চিহ্নায়কটি বেষ্টিত আবদ্ধ একটি আধারের ধারণাকে signify করছে। কোনো একটি text-এর মধ্যে তা কোনো ব্যক্তিমানুষের হৃদয়কে বোঝাতে পারে যা কোনও একটি বিশেষ ভাবকে সযত্নে সংরক্ষিত করেছে। আবার ভিন্ন কোনো আখ্যানের মধ্যে, বা ভিন্ন কোনো পাঠপ্রতিক্রিয়ায়, তা হয়তো একটি বদ্ধ সমাজব্যবস্থাকে চিহ্নিত করতে পারে, যার মধ্যে পুরনো মূল্যবোধগুলিকে অভ্যাসগতভাবে আগলে রাখা আছে। এইসূত্রেই বিষয়টি রোলাঁ বার্তের মিথ, এমনকি বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা কিংবা দেরিদার বিনির্মাণতত্ত্বের সঙ্গে কখনো কখনো অন্বিত হয়ে পড়তে চায়।

৪. এরপর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্যসুরের নির্বাচন ও নাকচকরণের তত্ত্ব। স্যসুরের মতে, 'Cat' ধ্বনিটি আসলে নিজেকে প্রকাশ করার পাশাপাশি 'Cow', 'Dog' ইত্যাদি ধ্বনির না-হওয়াকেও বোঝায়। স্যসুর Syntagmatic ও Paradigmatic : এই দুটি তলকে ব্যবহার করে একটি graph–এর ধারণা দেন। এইসূত্রে দেরিদার পার্থক্য ও স্থগন-সংক্রান্ত ভাবনাও নির্ভর করে আছে অনুরূপ তত্ত্বকাঠামোর ওপর। সাহিত্যিক বা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাবাদর্শগত জটিল তর্কসূত্রে বিষয়টি কার্যকরী হয়ে দেখা দিতে পারে।

৫. স্যসুরের তত্ত্বটি দ্বিতলবিশিষ্ট, পক্ষান্তরে চিহ্নবিজ্ঞানের আমেরিকান ঘরানার অন্যতম মধ্যমণি চার্লস স্যান্ডারস পার্স-এর উল্লিখিত কাঠামোটি একটি ত্রিভূজ মডেল। কিন্তু আমাদের কাছে, তিনি চিহ্নের যে একটি সম্ভাব্য শ্রেণিবিভাজন করেছিলেন (*Collected Writings*, 1931/58), সেটি গুরুত্বপূর্ণ। তাকে স্যসুরের তত্ত্বে প্রয়োগ করলে চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িত সম্পর্কের তিনটি প্রকারভেদ পাওয়া যায় (তার সঙ্গে আমরা এখানে প্রাচ্যের ধ্বনিতত্ত্বের বর্গীকরণের বিষয়টিও সমান্তরালভাবে অন্বিত করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি)।—

a. প্রতীক (symbol/symbolic): এক্ষেত্রে চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত বা অন্বিত নয়, উভয়ের মধ্যে এক সাধারণ প্রথাবদ্ধ সম্পর্ক বিরাজমান, যা বিশেষ কোনো 'যুক্তি' অনুসারে নির্ধারিত নয়। এই শ্রেণিতে যে ধ্বনি তৈরি হয় তা মূলত অ-বিবক্ষিত-বাচ্য,

কখনো তা হয় অর্থান্তরে-সংক্রামিত, কখনো-বা অত্যন্ত-তিরস্কৃত। প্রতীকের উদাহরণ হিসেবে লিপি, জ্যামিতিক নকশা, ট্রাফিক আলো, জাতীয় পতাকা প্রভৃতির কথা বলা যায়।

b. প্রতিমা (icon/iconic): এখানে চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতকে অনুকরণ করে গঠিত হয়, এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কোনো-না-কোনোভাবে গুণসাপেক্ষ সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। আমরা আমাদের সন্দর্ভের প্রয়োজনে একে দুটি ভাগে ভাগ করেছি।—

b1. মূর্ত : মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাদৃশ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই ভাগটিকে আমরা সংলক্ষ্য-ক্রম বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির পর্যায়ে ফেলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ ভাস্কর্য, কার্টুনচিত্র, পট, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যান্ত্রিকভাবে অনুকরণ-করা পশুপাখির ডাক প্রভৃতির কথা বলা যায়।

b2. ভাবসাদৃশ্যমূলক (metaphor): এখানে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত সম্পূর্ণ পৃথক দুটি সত্তা, কিন্তু পরস্পরের কোনো-না-কোনো (এক বা একাধিক) সাধারণ সাদৃশ্যবাচক ভাব কিংবা ধর্মকে অবলম্বন করে তারা সম্পর্কযুক্ত হয়, যা সবক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নাও হতে পারে। এটিও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির স্তর। সংলক্ষ্য-ক্রম বা অসংলক্ষ্য-ক্রম। উদাহরণ হিসেবে সেই ছায়ানিবিড় গাছতলা ও বন্ধুত্ব-বিষয়ক নমুনাটিকে এখানে হাজির করা যায়। 'গাছতলা' একটি স্থান এবং 'বন্ধুত্ব' বা 'আতিথেয়তা' একেকটি ভাবক্রিয়া, উভয়ের দৃশ্যত কোনো সাদৃশ্য নেই, কিন্তু উভয়ই দগ্ধ ক্লান্তজনকে প্রয়োজনীয় আশ্রয় দিতে পারে। তাই 'গাছতলা' চিহ্নায়কটি এক্ষেত্রে রূপক, অথবা অলংকারগুণে রূপকাতিশয়োক্তি (চক্রবর্তী: ২০০৬: ৬৭)।

c. নির্দেশক (index/indexical): এই শ্রেণিতে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত শারীরিক বা কার্যকারণগতভাবে সরাসরি সংযুক্ত। একেও আমরা আমাদের সুবিধার্থে দু-ভাগে ভাগ করে নিয়েছি।—

c1. প্রতিনিধিত্বমূলক (representaive): এখানে চিহ্নায়ক শারীরিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চিহ্নায়িতের সঙ্গে যুক্ত, চিহ্নায়িতেরই বিশেষ কোনো অংশ, বা অঙ্গ। এটিও নিশ্চিতভাবে সংলক্ষ্য-ক্রম বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: কারো বিপুল বৈভবের কথা বলতে গিয়ে হয়তো চিহ্নায়ক হিসাবে একটি প্রাসাদোপম বাড়ির উল্লেখ করা হল, বাড়িটি যদি বস্তুগতভাবেই সেই ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হয়, তবে তা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক (a representative index); আর যদি বাড়িটির বাস্তব কোনো জ্যামিতিক অস্তিত্ব না থাকে, তখন তা হবে রূপকধর্মী প্রতিমা (a metaphor icon)।

c2. হেতুবাচক (causal): এই ভাগে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক মূলত কার্যকারণসূত্রে সংযুক্ত। ফলাফলটিকে চিহ্নায়ক হিসেবে ধরে নিহিত কারণটিকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া। এটিও রূপকের মতো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির স্তর, যা সংলক্ষ্য-ক্রম বা অসংলক্ষ্য-

ক্রম দুই-ই হতে পারে। যেমন ধোঁয়া থেকে আগুনের অস্তিত্ব এবং উৎস টের পাওয়া সম্ভব। এইপ্রকার চিহ্নের একটি অসাধারণ উদাহরণ হিসেবে দাখিল করা যায় সংস্কৃত সাহিত্যের সেই বিখ্যাত শ্লোকটিকে, যেখানে বিয়ের কথায় লাজুক পার্বতী লীলাকমলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছেন।

অবশ্য এই ব্যাপারে আমাদের সততই সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, আমরা যেন এই শ্রেণিবিন্যাসটিকে পাঁচিল-তোলা খোপ হিসেবে না দেখি, বরং তার স্থিতিস্থাপকতায় বিশ্বাস রাখতে পারি। কারণ এমনটা প্রায়শই দেখা যায় যে, প্রতীক কখনো কখনো পরিণত হচ্ছে রূপকে, বা রূপক কখনো কখনো সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে প্রতীকভাবনায়; কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক কখনো কখনো বদলে যাচ্ছে মূর্ত প্রতিমায়, আর মূর্ত প্রতিমা প্রতিনিধিত্বে। কখনো আবার একটি চিহ্ন একাধিক শ্রেণিপর্যায়কে ধারণ করে থাকে— এমনও হয়। যেমন, 'ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়' ('বর্ষামঙ্গল', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) অংশটি একইসাথে হেতুবাচক নির্দেশক (ঘট ভেসে যাওয়া আসলে ঘাটে আগত নারীটির অন্যমনস্কতাকে ব্যঞ্জিত করছে), আবার একইসাথে রূপক-প্রতিমাও বটে ('ঘট' এখানে ঘাটে আগত নারীর ব্যাকুল হৃদয়ের রূপক)। অনুরূপ একটি লণ্ঠন ভেসে যাওয়ার দৃশ্য হিন্দি 'Devdas'(2002) সিনেমায় লক্ষ করা গেছিল: নদীতীরে নায়ক-নায়িকার সঙ্গম ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে ক্যামেরার ফোকাস নিবদ্ধ ছিল জলস্রোতে মৃদুমন্দ দুলতে দুলতে ভেসে-যাওয়া লণ্ঠনের উপর। লণ্ঠনের ভেসে-যাওয়া একদিকে যেমন নায়ক-নায়িকার বিষয়লুপ্ত আত্মহারা হয়ে যাওয়ার নির্দেশক, অন্যদিকে তা আনন্দলহরীতে ভাসতে-থাকা প্রেমিকযুগলের হৃদয় বা সংযমের প্রতিমা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কথাসাহিত্যের জন্ম থেকে আধুনিকতা : চিহ্নচেতনার সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তন

গুহাকন্দরে বসে আদিম মানুষের গল্প বলা থেকে শুরু করে মুদ্রণযুগের তথাকথিত আধুনিক ছোটোগল্প ও উপন্যাস— কথাসাহিত্যের এই হয়ে-ওঠার দীর্ঘ যাত্রাপথটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তার মধ্যে কিছু সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার অভিঘাত আমাদের চোখে পড়বে। চিহ্নের পূর্বকৃত বিভাজনের নিরিখেই আমরা কথাসাহিত্যের এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার অভ্যন্তরীণ ধর্মগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনমাফিক লোককথার বিভিন্ন Type-index ও Motif-index এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজেতিহাসের কিছু কিছু যুক্তিতথ্যকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হতে চেয়েছি। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যুক্তি ও অনুসন্ধানগুলিকে, আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত রেখেছি, যেগুলি মোটামুটিভাবে এইরকম—

১. একটি প্রথা, ফলিত কুসংস্কার ও প্রতিমার নির্মাণ: এখানে আমরা জ্ঞাত হয়েছি, আদিম মানুষের একটি জাদুক্রিয়ামূলক সংস্কার কীভাবে তার টোটেম-সম্পর্কিত প্রতীকভাবনাকে অতিক্রম করে, তাকে বিমূর্তায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তখনও অবধি তাকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের উপরেই।

২. নীতিকথার উদ্ভব, লেখকের জন্ম ও রূপকের বাস্তবতা: এই পর্যায়ে আমরা অনুধাবন করতে চেয়েছি, যখন সামাজিক অনুশাসনগুলি সুদৃঢ় হচ্ছে ক্রমশ, তখন পশুকথাই কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে নীতিকথায়, প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নের মধ্য থেকে আহরিত হচ্ছে রূপক, এবং সেই কর্তৃত্বময় 'লেখক'-এর (the author) জন্ম হচ্ছে পরবর্তীতে বার্ত যার মৃত্যুর আর্জি আনবেন।

৩. রূপকথার বিকাশ: এই পর্যায়ে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়— কোন্ সাংস্কৃতিক পরিসরে বিকাশলাভ করল রূপকথা, কীভাবে তা হয়ে উঠল নিম্নবিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীজয়ের ঔপনিবেশিক স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার বিনির্মাণ, কোন্ সমীকরণে তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে মিশে গেল সুখী স্থিতিশীল গৃহকোণের মায়া ও শুভবোধের সংযম।

৪. পাল্টা রাজনীতি, রোমান্সের বীজ, লেখকের স্বৈরতন্ত্র: এই পর্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছি, রোম্যান্সকে রূপকথার একটি বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী পর্যায় হিসেবে কতটা চিহ্নিত করা সম্ভব, কীভাবে তাতে রূপকের ভাষা ক্রমশ স্থানান্তরিত হতে হতে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের প্রাধান্য দেখা গেল, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে কোন্ বিশেষ চিহ্নের রাজনীতি।

৫. প্রতিনিধির ভিড়, বণিকতন্ত্র ও আধুনিকতার স্বরূপ: সর্বোপরি এই পর্যায়ে আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি, ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র-প্রসূত পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক চিহ্নচেতনা কীভাবে এক নতুন আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্মাণ করছে, যার গর্ভে লালিত আজকের ছোটোগল্প ও উপন্যাস, যা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশকের একচেটিয়া প্রয়োগকে অবলম্বন করে গড়ে উঠছে, রূপকের ভাষা হয়ে উঠছে প্রান্তিক প্রলাপ মাত্র।

বস্তুত, কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ভাগগুলির বিকাশ-সংক্রান্ত ইতিহাস রচনা ও তার কালানুক্রমিক তথ্যপঞ্জিকরণ আমাদের কর্তব্য নয়। আমরা কেবল এই বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমাজব্যবস্থার নিরিখে চিহ্নতাত্ত্বিক বিবর্তনের একটি রূপরেখা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কীভাবে কারো ছবি অবিকল আঁকা তার বিরুদ্ধে তুকতাক করার সমতুল মনে করা হত (কোসাম্বি: ২০০২: ৩৭), আদিম লোকমানস তাই পশুর মূর্ত প্রতিমা আঁকলেও কখনো সে নিজের মূর্ত প্রতিমা গড়ার সাহস অর্জন করতে পারেনি, সে ক্রমশ হেঁটে গেছে বিমূর্তায়নের দিকে, নিজেকে সে প্রকাশ করতে চেয়েছে 'জন্তুর মুখোশ পরা' অবস্থায়, পশুর মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে চিহ্নায়িত করেছে নিজস্ব পরিমণ্ডল। এই প্রবণতারই ছাপ হয়তো লক্ষ করা যাবে লোককথার সূচনায়, বিশেষত পশুকথাগুলির মধ্যে, যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে লোককথা বলতে বুঝে নিতে হবে পশুকথাকেই (Leach: 1949: 61)। যদিও সাহিত্যের একেবারে উন্মেষপর্বে পশুকে মানুষের সমান্তরালেই পৃথকভাবেই আঁকা হচ্ছে। কীভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি আফ্রিকান লোককথার ('চালাক খরগোসের গল্প', Fairly stories from Africa—Retold by Florence A. Tapsell) গল্পের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন 'পঞ্চতন্ত্র'-এর দুটি গল্পের অঙ্কুর (যথাক্রমে মন্দমতি সিংহের গল্প ও সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের গল্প) যেগুলি আসলে নীতিকথা। এইসূত্রে আমরা দেখেছি, দিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর বইতে লোককথার যে আটটি শ্রেণিবিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে নীতিকথার উল্লেখ থাকলেও (২০০৯ : ১৮), পরে নিজে তিনি যখন লোককথার শ্রেণিবিভাজন করছেন (২০১২ : ৮১) তখন তাতে 'নীতিকথা' ভাগটি থাকছে না। এমনকি লোককথার সুপ্রচলিত টাইপ-ইনডেক্স-তালিকাতেও (Aarne-Thompson : 1928) প্রধান টাইপ হিসেবে নীতিকথার কোনো উল্লেখ নেই; কেবল তার মধ্যে 2.B. Religious Tales ও 2.C. Aitiological Tales এই উপবিভাগ দুটিকে একসাথে দিব্যজ্যোতি মজুমদার 'ধর্মীয় ও নীতিমূলক কাহিনি' (৭৫০-৮৪৯) নামে তর্জমা করছেন (২০১২ : ২৪)। বস্তুত এই 'নীতিমূলক কাহিনি'গুলিও কিন্তু পুরোপুরিভাবে সমস্ত নীতিকথাকে চিহ্নিত করে না, কারণ নীতিকথার অধিকাংশই পশুচরিত্রের উপর নির্ভরশীল (*Encyclopaedia Britannica*, 1970 Ed. Vol. 9. Page 22)। সেই মর্মে আমাদের মনে

হয়েছে, নীতিগল্প তাই লোককথার কোনো পৃথক শ্রেণি নয়, তা আসলে পশুকথারই একটি পরিশীলিত রূপ, একটি উন্নততর পর্যায়, যা অবলম্বন করে থাকে অতিশয় রূপকের ভাষা, ছুঁয়ে থাকে চিহ্নের দ্বিতীয় স্তর। সমাজ যখন আরও বেশি সংগঠিত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, দ্বিবাচনিকতার স্তরগুলি হয়ে পড়েছে আরও বেশি জটিল, তখন আরও যথাযথভাবে নিজেকে ও সমাজকে চালিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে নীতিশিক্ষার; তাই সে পশুকথার মধ্যে থেকে চিহ্ন আহরণ করে তাকে একমুখী (একমাত্রিক নয়) ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করেছে, পশুর মধ্য দিয়ে নিজেকে চিহ্নায়িত করার তাড়নায় সে নিজের অজান্তেই প্রতীক ছাড়িয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্দেশক ছাড়িয়ে জন্ম দিয়েছে রূপক প্রতিমার। পশুর প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ আসলে মানুষের: এভাবেই যে রূপকের বোধ গড়ে উঠল তা মানুষকে ও তার চারপাশকে আক্ষরিক তাৎপর্যের বাঁধন থেকে মুক্তি দিল। দিব্যজ্যোতি মজুমদার বাংলা লোককথার মধ্য থেকে যে মোট ১৪৭৩টি মোটিফ খুঁজে পেয়েছেন (২০১২ : ১৯৯-২৫০, ২৬০-২৬৮), তার মধ্যে কমপক্ষে ১০০০টিকেই রূপক হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব। এবং জাদুবাস্তবও আসলে রূপক-প্রতিমারই চিহ্নায়ন। রূপকথার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এটি সূচনা সূর্য বা অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি বা উপাদানকে কেন্দ্র করে হলেও পরবর্তীতে পৃথিবীজয়ের ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি স্থিতিশীল সুখভোগের বাসনা ইচ্ছেপূরণের গল্প হয়ে বিকশিত করছে রূপকথার ভুবন, যা আর এক সমান্তরাল বাস্তবতা, যেখানে কিন্তু নীতিকথার মতো (unlike the parables) লেখকের সচেতন খবরদারি নেই। পাশাপাশি এও লক্ষণীয়, পৃথিবীজয়ের ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা ও সুখী নিরুপদ্রব গৃহকোণের স্বপ্ন— এই দুটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা, যা সৃজনী প্রেরণা হয়ে রূপকথাকে নির্মাণ করেছে, তা রোমান্সের ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল। রূপকথা যেখানে মূলত নিম্নজীবি শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীজয়ের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার বিনির্মাণ, যার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে সহজসরল সুখী গৃহকোণের মায়া, ফলত যা রূঢ়ভাবে আর ঔপনিবেশিক নয়; পক্ষান্তরে রোমান্স আসলে সেই একই আকাঙ্ক্ষার বস্তুগত নির্মাণ, তবে তা অভিজাত-শ্রেণির অবস্থান থেকে দেখা। তাই রোমান্সের মধ্যে বিমূর্তায়নের বদলে এক বস্তুগত নির্দিষ্টকরণ লক্ষ করা যায়। রূপকথার রাজা, রানি, রাজপুত্র ও ভিনদেশি রাজকন্যা রূপকধর্মী চিহ্নায়কের পরিবর্তে প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়ক হিসেবে বিনির্মিত হতে থাকে। গুণাঢ্যের ‘বৃহৎকথা’-র রাজা উদয়ন বা রাজপুত্র নরসিংহ দত্ত কিংবা দণ্ডীর ‘দশকুমার চরিত’-এর কুমার রাজবাহন (নামচিহ্নের প্রয়োগ), কাউকেই আমরা সাধারণ সর্বস্তরের মানুষের চিহ্নায়ক হিসেবে ভাবতে পারি না, যা রূপকথার রাজপুত্রদের ক্ষেত্রে পারি। তাই বলা যায় রোমান্স প্রায় রূপকথার বিপরীতে লেখকের স্বৈরতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাত্ত্বিক এবং আক্ষরিক— কিছুটা দুই অর্থেই। সর্বোপরি আমরা টের পেয়েছি, প্রাচীন লোককথা থেকে জাতক, পঞ্চতন্ত্র,

আরব্যরজনী হয়ে ‘দেকামেরন’ বা ‘ক্যান্টারবেরি টেলস’ অবধি লোককথার টাইপগুলি যদি আমরা নিরীক্ষণ করি তাহলে দেখব সমীক্ষাগতভাবে মূল টাইপগুলির প্রাধান্যের ছকটি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে : ১. পশুকথা, ২. সাধারণ লোককথা (যার বেশিরভাগটাই ঐন্দ্রজালিক কাহিনি) ও ৩. হাসি ও পারিবারিক কাহিনি— জাতক-পঞ্চতন্ত্র অবধি যাকে ক্রমতালিকায় এভাবে সাজানো যেতে পারত, ‘দেকামেরন’ বা ‘ক্যান্টারবেরি টেলস’ অবধি পৌঁছে তাকে সাজানো চলে এভাবে : ১. হাসি ও পারিবারিক কাহিনি, ২. সাধারণ লোককথা (যার বেশিরভাগটাই ঐন্দ্রজালিক কাহিনি নয়) ও ৩. পশুকথা (যা নীতিকথারূপে বিরাজমান)। একটি প্রাচীন পশুকথা ‘বক ও কাঁকড়ার কথা’ জাতকে এমনভাবে ব্যবহৃত ও পুনর্ব্যাখ্যাত হয়েছে যে তার তাৎপর্য একটি উদ্দেশ্যমূলক পরিসরে সীমায়িত হয়ে এসেছে। এই উদ্দেশ্যমূলকতা অন্য মাত্রা পেল পঞ্চাদশ-ষোড়শ শতকের ইউরোপে। বিশেষত ইতালীয় নবজাগরণের মধ্য দিয়ে। ইতালীয় নবজাগরণ ছিল মূলত একটি সাংস্কৃতিক বাঁকবদল; কিন্তু তার প্রেক্ষাপট অবশ্যই সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে বণিকতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে; যেখানে পুঁজির বিকাশ ও নতুন নতুন বাজারের সন্ধান জন্ম দিল এক বুর্জোয়া উপনিবেশবাদের। এবং যেহেতু পণ্যবাদী চিন্তা ও জীবনবোধ ভীষণভাবেই বস্তুনির্ভর, তাই সেই সম্পর্কিত সাহিত্যচেতনা যে রূপকের বাস্তবতাকে মুছে ফেলবে ও প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নকে অবলম্বন করেই বিকশিত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। ১৮-১৯ শতকের ইউরোপে এই প্রক্রিয়াই সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরও ত্বরান্বিত হল। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে লেখনী নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করল প্রকাশক ও গ্রন্থবিক্রেতাদের হাতে। এইরকম একটি সমাজে খুবই স্বাভাবিক— বস্তু, যা আসলে পুঁজি, তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় মানুষ তার অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে চাইবে। খুঁজতে চাইবে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা। চাইবে পরিচিতির মুনাফা ও মালিকানাস্বত্ব। এইভাবে শুধু ইংলন্ডে নয়, গোটা ইউরোপেই, এমনকি তার ঢেউ লেগে আমাদের প্রাচ্যদেশেও, বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক চিহ্নচেতনা যে উনিশ শতকীয় আধুনিকতাকে নির্মাণ করেছে, তারই গর্ভে লালিত পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্প।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের চিহ্নকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ইতিপূর্বে আমরা প্রাচীন জনশ্রুতিনির্ভর মৌখিক (বর্তমানে মুদ্রিত) লোককথাগুলির সম্ভাব্য জন্মকাল তথা আঁতুড়ঘর থেকে শুরু করে হাঁটতে হাঁটতে সাম্প্রতিক সময়ের মুদ্রিত ও পঠিত (প্রধানত বাংলা) 'আধুনিক' গল্প-উপন্যাসের ফটকদরজা অবধি পৌঁছানোর পর যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আমাদের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কথাসাহিত্যের বর্গায়িত রূপরেখাচিত্র ও চিহ্নচেতন চেহারা-চরিত্রের বিবর্তনতালিকা নির্মাণের দ্বারা মূলত মুদ্রণনির্ভর বাংলা গল্প-উপন্যাসের আলোচনায় প্রবেশ করার একটি পাদভূমি আমরা গঠন করতে চেয়েছি। সেখানে বিশেষত রূপকচিহ্নের প্রয়োগকেই প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি আমাদের প্রগাঢ়রকম প্রেম ও পক্ষপাতিত্ব। কারণ আখ্যানের রূপকধর্মিতাই সময়ের বহুমাত্রিক পাঠগুলিকে বয়ানের গভীরতলে লুকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে সমর্থ হয়, তাকে জুড়ে দিতে পারে আবহমানের শরীরে, যদিও এই প্রকল্পে নির্দেশকচিহ্নের গুরুত্বও নেহাত কম কিছু নয়। আমরা এখানে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে 'কল্লোল'-সমসাময়িক বা 'কল্লোল'-পরবর্তী কোনো কোনো লেখক যথা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ পেরিয়ে আরও পরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কিংবা বিমল কর, হাংরি গোষ্ঠীর গল্পকার বাসুদেব দাশগুপ্ত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের লেখকদের কেউ কেউ, এছাড়া সুবিমল মিশ্র, নবারুণ ভট্টাচার্য কিংবা সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অবধি দীর্ঘ সময়ের সাহিত্যকারের রচনা থেকে কিছু-বা এলোমেলো ও খাপছাড়াভাবেই নানাবিধ ব্যঞ্জনার ভাষা ও ভাঁজ কিংবা অভিব্যক্তিগুলিকে আহরণ করে যথাসম্ভব বিশ্লেষণ ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বুঝতে চেয়েছি চিহ্নতাত্ত্বিকতার বিচিত্র সম্ভাবনা ও সংলাপ।

৩.১ চিহ্নের লোকায়ত বীজ: জাদুব্যঞ্জনার গহনভাষ্য ও ত্রৈলোক্যনাথ

আগের অধ্যায়টি যে-যুক্তির পাদপীঠে এসে মিশেছে, সেই যুক্তিতত্ত্বকেই মৌল একক ধরে আমরা পরবর্তী আলোচনায় পদার্পণ করতে চেয়েছি। ইউরোপে রেনেসাঁ-প্রসূত বুর্জোয়া সমাজ-কাঠামোয় চিহ্নচেতনার নতুন সংস্করণ যে আধুনিকতার জন্ম দিচ্ছে, সেখানেই ক্রমশ মাথা তুলছে কথাসাহিত্যে উপন্যাসের জয়ধ্বজা। এই তথাকথিত নবজাগরণের ঢেউ যে এ-দেশেও আছড়ে পড়েছিল, সে বিষয়েও আমরা সকলে অবহিত। ইউরোপীয় সমাজের সেই একই প্রেক্ষিত একই মোটিফ আমাদের তৎকালীন বাংলাদেশেও, একটু দেরিতে, বিবর্তনের বিশেষ ধারায় লক্ষ করা যায়। বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে মুদ্রণযন্ত্রের যোগটি যে ওতপ্রোত, সে-প্রশ্নে আমাদের দ্বিমত হওয়ার কোনো জায়গা নেই। এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের (একটা ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে হলেও) একটা সমাজতাত্ত্বিক অভিমুখ রয়েছে, তা হল 'রেনেসাঁস-পরবর্তী মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ' আর সেই যন্ত্রশিল্প মূলত 'নাগরিক ও বণিকতন্ত্রী সমাজের সৃষ্টি' (ভট্টাচার্য: ২০০৩ : ১০৫)। আর বণিকতন্ত্রী সমাজের সঙ্গে প্রতিনিধিত্বমূলক বাস্তবতার সংযোগের ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যেই মতামত প্রকাশ করেছি। সুতরাং আমাদের মতে, সমাজতাত্ত্বিক নিয়ম মেনেই, বাংলা কথাসাহিত্যের এই বিকাশও, প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নভাবনাকে অবলম্বন করেই হয়েছিল। ১৮২১ সালের ৯ই জুন 'সমাচার দর্পণ'-এর জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত সংখ্যায় 'বাবুর উপাখ্যান'-এর প্রথম অংশ থেকে শুরু করে বাংলা উপন্যাসের দীর্ঘ সূচনাকাল, কিংবা তথাকথিত বঙ্কিমযুগ, প্রায় সমস্তটাই এই ক্ষমতা-কেন্দ্রিকতার অংশ। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিসরে এই বাস্তবতার এক স্বাভাবিক ধর্ম আছে, তা হল, এর ভিতরকার দ্বন্দ্ব, এর ভিতরকার দ্বিবাচনিক কাঠামো, যা এদেশীয় প্রেক্ষিতে এক নিজস্ব উন্মেষ। একদিকে যেমন আলোকপ্রাপ্তি, ইউরোপীয় যুক্তিবাদ নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নিচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিকে, আবার পাশাপাশি দেশীয় লোকসংস্কৃতির এক পরাজিত ঐতিহ্যও অন্তঃসলিলা হয়ে রয়ে গেছে। যা শুধু রক্ষণশীলদের নেতিবাচক স্থূল বিরোধিতার মধ্যেই দৃশ্যমান নয়, সেই একমাত্রিক স্তরটুকু অতিক্রম করলে দেখা যাবে, কখনও তা গঠনমূলক সূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাসরূপেও তার বাষ্পবিকিরণ করেছে। ইউরোপীয় বণিকতান্ত্রিক সভ্যতার চিহ্নচেতনার আগ্রাসনের ভিতর দাঁড়িয়ে বহু লেখকই হয়তো প্রাচ্যপৃথিবীর নিজস্ব চিহ্নবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা বুঝি-বা প্রচ্ছন্নই রয়ে গেছে।

সেই মর্মে আমরা প্রধানত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *কঙ্কাবতী* (১৮৯২) ও অল্পস্বল্প কিছু আনুষঙ্গিক গল্পকাহিনিসূত্র অবলম্বন করে দেশীয় প্রতিস্বরটুকু চিনে নেওয়ার আগে সন্তর্পণে বুঝে নিতে চেয়েছি বাংলা উপন্যাসের ইউরোপীয় ধাঁচের প্রতিস্পর্ধী অন্যান্য যা-কিছু প্রয়াস

উনিশ শতকে দেখা গিয়েছিল তার স্বরূপ ও তাৎপর্যটুকু ঠিক কেমন ছিল। তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর বইতে এইরকম কিছু টেক্সট-কে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে কিনা "একই পাঠকৃতিতে একাধিক সন্দর্ভ পরস্পর-নিবিষ্ট হয়ে সামাজিক অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে"— অথচ শেষমেশ, যে-আখ্যানগুলি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বিকল্প বয়নের সম্ভাবনা তৈরি করেও ওইসব রচনা যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো—তারও প্রধান কারণ ঘনায়মান ঔপনিবেশিক সমাজ-সংস্থার সাংস্কৃতিক রাজনীতি" (১৯৯৬ : ৭৩)। এবং এগুলির মধ্যে যে দুটি টেক্সট-কে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়, সেই *আলালের ঘরের দুলাল* (লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র) ও *হুতোম পেঁচার নক্‌শা* (লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ) সম্পর্কেও তিনি মূল্যায়ন করেন— "দুটি প্রতিসন্দর্ভের নির্মাতা যেহেতু সামাজিক অবস্থানগত অনিবার্যতায় অন্তেবাসী জনের পরিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারেন নি এবং তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনা সত্ত্বেও বয়নের অন্য কোনও বিকল্প অবলম্বন নির্দেশিত হয় নি—আখ্যান-সংগঠনের প্রতীচ্যায়িত ধারার সমান্তরাল প্রতিস্রোত গড়ে উঠলো না" (৭২)। তপোধীরবাবুর এই খেদোক্তিকেই আমাদের সমর্থনবাক্য হিসেবে ধরে আমরা আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আসলে *আলালের ঘরের দুলাল* বা *হুতোম পেঁচার নক্‌শা* যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহায্যে রক্ষণশীলদের গোঁড়ামি ও নতুন মধ্যবিত্ত বাবুসম্প্রদায়ের ভণ্ডামিকে কটাক্ষ করুক না কেন, তা শেষমেশ উপন্যাসের পাশ্চাত্য মডেলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারল না, কারণ সেগুলিতে 'বয়নের অন্য কোনও বিকল্প অবলম্বন' নির্দেশিত হল না, গড়ে উঠল না 'আখ্যান-সংগঠনের প্রতীচ্যায়িত ধারার সমান্তরাল প্রতিস্রোত'। তার প্রধান কারণ, তপোধীরবাবুর কথামতো, 'ঘনায়মান ঔপনিবেশিক সমাজ-সংস্থার সাংস্কৃতিক রাজনীতি'; আমরা এখানে তপোধীরবাবুর বয়ান থেকে খানিক সরে এসে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, সেই 'সাংস্কৃতিক রাজনীতি' মূলত চিহ্নের রাজনীতি, সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ চিহ্নতাত্ত্বিক প্রবণতার আগ্রাসন। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে, স্বাভাবিক সমাজতাত্ত্বিক কারণেই ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র তার সাংস্কৃতিক পরিসরে যে প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়ককেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছে, সেই চিহ্নের বোধকে পাথেয় করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক উপন্যাস। প্রাচ্যদেশের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত উপন্যাসও একই চিহ্নভাবনাকে লালন করে। প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখেরা পাশ্চাত্যবাহিত বণিকতন্ত্রপ্রসূত আধুনিকতার অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করলেও, যেহেতু তাঁরা প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নকেই অবলম্বন করেছেন, আখ্যানের বয়নে রূপকের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেননি, তাই সেসব রচনা যে শেষাবধি ইউরোপীয় ছকের বিপরীতে বা সমান্তরালে কোনো জোরালো প্রতিস্রোত তৈরি করতে পারবে না, তা যেন একপ্রকার পূর্ব-নির্ধারিতই ছিল।

যা-হোক, আলোচ্য এই *কঙ্কাবতী* উপন্যাসটির সূচনায় খুব সাধারণ গৌরচন্দ্রিকার মতো ‘প্রাচীন কথা’ শিরোনামে লোককথার যে গল্পটির অবতারণা করা হয়েছে, সেখানে আমরা দেখি, ভাই ভগিনীকে বিবাহ করতে চাইছে এবং ভাইয়ের খামখেয়ালি ইচ্ছের বিরুদ্ধে যখন সমাজে কোনো প্রতিরোধ নেই, তখন মরিয়া প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় কঙ্কাবতীকে নিজেকেই, যা ওই ব্যবস্থার ভূমিতে থেকে সম্ভব নয়, তাই কঙ্কাবতী গড়ে তোলে নিজস্ব ‘নৌকা’, ভেসে যায় খিড়কি পুকুরের মাঝখানে। কঙ্কাবতীর ‘নৌকা’ তার স্বনির্ভরতা অর্থাৎ আত্মশক্তির রূপক। যা তাকে নিয়ে যায় পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ‘খিড়কি পুকুরের মাঝখান’ সেই প্রতিস্পর্ধী বিকল্প জগত, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার হাত পৌঁছয় না; কঙ্কাবতীর ‘ভাই’, যে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি, সে কঙ্কাবতীকে ‘বিবাহ’ করতে অর্থাৎ তার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে না; খিড়কি পুকুর হয়ে ওঠে কঙ্কাবতীর নিজস্ব স্পেস। এবং প্রাচীন ইতিহাসের চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা জানেন যে পুকুর বা ‘পুষ্করিণী’-র সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে। সুতরাং লোককথার গল্পটি আসলে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাবৃত্তকে অস্বীকার করে প্রতিস্পর্ধী পরিসর খুঁজে-নেওয়া এক নিরুপায় নারীর গল্প। এই গল্পটিকেই ত্রৈলোক্যনাথ পুনর্বিন্যস্ত (বিনির্মাণ?) করলেন উনিশ শতকের আলো-অন্ধকার বাংলাদেশের সময়-পরিসরে।

সেই সূত্রে যে-আখ্যান তিনি পেশ করতে চলেছেন তা যে ‘শহর অঞ্চল’ তথা কেন্দ্রীভূত নাগরিক সমাজ-সংস্কৃতির গল্প নয়, প্রতিকল্পে তিনি যে ‘বন্য প্রদেশ’ তথা প্রান্তিকায়িতের বয়ান ফুটিয়ে তুলতে চান, তা যেন শুরুতেই খানিক স্পষ্ট করে তোলেন। আর পাঠক সেই আখ্যানের পরিসরে কার্যত প্রবেশ করে রূপকের দরজা দিয়ে। ভিতরেও সাজানো থাকে রূপকভাষ্যের বিচিত্র সম্ভার, এক স্বপ্নের জাদুকার্নিভাল— আমরা দেখি জলের নিচে মাছেদের সভা ও সমিতি, কাঁকড়া ও ঝিনুক, বালিশ বা শিমুলতুলো, নদীবক্ষে জীবন্ত পাথর, পথিমধ্য তৃণরূপী ডাইনি, শেকড়ের গুণে বাঘ-হয়ে-যাওয়া মানুষ, খোক্কস থেকে শুরু করে নক্ষত্রলোকের সেপাই, বিষণ্ণ ব্যাঙসাহেব, করোটি ও কংকাল, মশাদের সমাজ কিংবা শাসনব্যবস্থা— যেগুলির প্রায় সবই, বিচ্ছিন্নভাবে বা একত্রিতভাবে, বিশেষ কাল ও নির্বিশেষ কালের ব্যপকতর ও গভীরতর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে; যেমন ডমরুধর-বিষয়ক আখ্যানে সেই অতিপ্রাকৃত কুমীর; অথবা ‘লুল্লু’ গল্পের সেই ভূত— যা রূপকার্থে মুদ্রণশাসিত ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে চিহ্নিত করে। এবং সামগ্রিকভাবে তারা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে, চিহ্নায়ক-প্রকরণে রূপকের প্রয়োগকে অবলম্বন করার ফলে কত সহজেই সময়ের বহুমাত্রিক বয়ান উঠে আসছে, যার ভিতর একীভূত আধিপত্যের রাজনীতির প্রতিস্পর্ধী বিকল্পপাঠ গড়ে ওঠা সম্ভবপর হচ্ছে। পরিবর্তে লেখক যদি ঔপনিবেশিকতার নিয়ন্ত্রণ মেনে তথাকথিত নির্জলা বাস্তব আখ্যান লেখার চেষ্টা করতেন, রূপকচিহ্নের বিমূর্ততা বর্জন করে গতানুগতিক মূর্ত কাহিনি রচনায় মনোনিবেশ

করতেন, তা মূলত ক্ষমতার বৃত্তগুলিকেই পরোক্ষে পুষ্টতা দিত, এবং তা শত প্রয়াস সত্ত্বেও সর্বার্থে (বণিকতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুরুষতন্ত্রের বিপরীতে) কোনো জোরালো প্রতিস্রোত তৈরি করতে হয়তো শেষমেশ ব্যর্থই হত।

৩.২ বস্তু ও ব্যঞ্জনার সমঝোতামূলক সহাবস্থান: রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরোত্তর

ইত্যবধি আলোচনায় আমরা রূপকচিহ্নের প্রয়োগের বিষয়টিকেই মূলত গুরুত্ব প্রদান করতে চেয়েছি; কাহিনির বয়নে রূপকের বাস্তবতার নির্মাণ কীভাবে বয়ানের বহুমাত্রিকতাকে প্রকাশ করে তা-ই আমাদের এই সন্দর্ভসূত্রের মূল প্রতিপাদ্য। পূর্ববর্তী আলোচনাসভায় আমরা ত্রৈলোক্যনাথের রচনা সম্পর্কে অভিমত গঠন করার চেষ্টা করেছি, যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্নায়কের একস্তরীয় আদলকে ছাপিয়ে ব্যঞ্জনার ভিন্ন গভীরতা আখ্যানের চরিত্রকে প্রভাবিত করে। আর এখানে, এই বিশেষ পঠনপাঠনক্ষেত্রে আমরা পরবর্তী কালের কথাসাহিত্য, মূলত গল্পসাহিত্য থেকে, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেইসাথে জরুরি আলোচনাসূত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিংবা জগদীশ গুপ্ত প্রমুখের লেখা থেকেও প্রয়োজনমাফিক, বিচিত্র ও বহুবিধ চিহ্ন আহরণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা বিবর্তিত ব্যঞ্জনার ভাষা ও ভঙ্গিটুকু যথাসাধ্য বুঝে নিতে চাইছি।

এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু প্রধানত রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' দিয়ে আমরা মূল আলোচনাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চেয়েছি। কারণ গল্পটিতে বয়ানের ব্যঞ্জনাগত বোধগম্যতার ঝোঁক সম্বন্ধে বিশেষ কূটজিজ্ঞাসা উত্থাপনের সুযোগ আমরা পেয়েছি। গল্পটির ভিত্তিমূলে লোককথার যে ভান ও ভণিতাটি রয়েছে, তা হল একটি কাদাখোঁচা ও একটি কাঠঠোকরার কাহিনি। যদিও গল্পের আদলে আলোচ্য দুই পক্ষীজাতির নিত্যকালীন স্বাভাবিক ধর্মকেই আসলে প্রকাশ করা হয়েছে আবহমান বাস্তবের রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে। উল্লেখ্য যে, লোককথার আদলে ব্যক্ত এই ব্যঞ্জনাগহন অভিজ্ঞতার বার্তা, অর্থাৎ কাদাখোঁচা ও কাঠঠোকরার কথাটুকুই গল্পের সবটুকু নয়, তাকে ধারণ করে আছে প্রসঙ্গের প্রণিধানযোগ্য পাটাতন; যেখানে বসে কথক তথা গল্পলেখক তাঁর হতাশাবিহ্বল বেদনার ভাষ্য উপস্থাপন করছেন (যার মধ্য দিয়ে একইসাথে অদৃশ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সক্রিয় উপস্থিতিও ব্যঞ্জিত হচ্ছে)। সেই অনুযোগের মধ্যে নিহিত উদ্দিষ্ট শ্রোতাদের চরিত্রাভাস যখন ওই কাদাখোঁচা ও কাঠঠোকরার জীবনচর্যাতেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, তখন সেইসকল শ্রোতাব্যক্তির সঙ্গে উক্ত পক্ষীজাতির জরুরি ভাবসাদৃশ্যটুকু প্রকট হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত, আমরা দেখি, উক্ত গল্পটি নিছক পেশ করেই গল্পকথক ক্ষান্ত হননি, ব্যবহৃত রূপকের অভিপ্রেত তাৎপর্য খানিক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করারও চেষ্টা করেছেন। অন্তর্নিহিত দ্যোতিতের কথা (connotation) সরাসরি ব্যক্ত করেননি ঠিকই, তবে দ্যোতকের গূঢ়ার্থ পাঠকের কাছে যথাসম্ভব বোধগম্য করে তুলতে চেয়েছেন সাদৃশ্যধর্মের বিশ্লেষণমূলক উপস্থাপনায়। বস্তুত এইধরনের ব্যাখ্যাপ্রবণ অর্থবাচকতা রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে নানা জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ করা যায়। এই সূত্রেই আমাদের মনে হয়েছে: রবীন্দ্রনাথ নিজেই যথেষ্ট দ্বিখণ্ডিত ছিলেন নিজের সাহিত্যরুচিগত

ঝোঁক বা প্রবণতার বিষয়ে; পাঠক হিসেবে তাঁর নিজেরও যেন-বা একপ্রকার অবস্থানগত দোলাচল ছিল। একদিকে তিনি মনে করছেন যে, গল্পের 'মাথামুণ্ডু অর্থ' অবলীলায় বুঝতে গেলে পাঠককে 'কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত' হতে হবে— অর্থাৎ বাচনের অভিধাগত অর্থের গভীরলোকে লুক্কায়িত ব্যঞ্জনামূলক তাৎপর্যের বয়ানকে অনুধাবন করার অক্ষমতাকে কথক এখানে অপরিণত-মনস্কতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে ধরছেন; অথচ পক্ষান্তরে *কঙ্কাবতী* উপন্যাসের রূপকের ভাষা ও ব্যঙ্গাত্মক জাদুবাস্তবকে তিনি সাবালকত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে মূক কিংবা দ্বিধান্বিত থেকেছেন, প্রশংসা (স্তুতি) করেও কেবল একপ্রকার শিশুমনোরঞ্জনমূলক কাহিনি হিসেবেই যেন-বা আখ্যানটিকে রাখতে চেয়েছেন ('সাধনা', ফাল্গুন ১২৯৯)। সুতরাং একদিকে তিনি গল্প-উপন্যাসের রেনেসাঁ-প্রসূত বাচনপ্রণালীর প্রতি সম্পূর্ণ কায়মনোবাক্যে সমর্পিত হতে চাননি; আবার একইসাথে দেশীয় লোকায়ত ভঙ্গির সমর্থনে জোরালো প্রতিস্পর্ধী ধারার বিকাশেও উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় হতে পারেননি। তবে তাঁর সাহিত্যিক মানসলোকের এই অপূর্ব দ্বান্দ্বিকতার ফলাফল যে ভাবীকালের পক্ষে ততখানি অশুভ হয়নি— বিতর্কের সেই কুয়াশা-ক্রূর সূচনাবিন্দু থেকেই আমাদের সমালোচনা-সন্দর্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

তাঁর বহু লেখাতেই রবীন্দ্রনাথ রূপকের ব্যঞ্জনাশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন দেশকাল তথা সমাজমানসের ত্রুটিগুলিকে কটাক্ষ করার ক্ষেত্রে। কিংবা কখনো কখনো নির্দেশক-চিহ্নের নিপুণ প্রয়োগও আমরা তাঁর রচনায় লক্ষ করি। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে এইরূপ রূপক-সাংকেতিকতাকে আমরা মোটামুটি চারটি বা পাঁচটি চালচলনে বর্গায়িত করতে চেয়েছি; সেগুলি যথারীতি হল—

ক) রূপক যেখানে প্রকট ও প্রবচনধর্মী: কখনো কখনো খুব প্রথাগত ছাঁচে লেখক কোনো-না-কোনো প্রাচীন, প্রচলিত বা বহুকথিত চিহ্ন-সূচকের প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন কোনো বিশেষ বক্তব্যকে পেশ করতে গিয়ে। যদিও সেখানে অতিশয়োক্তির আড়ালটুকু থাকছে, কিন্তু আখ্যানের পরিপুষ্ট রূপকধর্মিতা পাঠকের অগোচর থাকছে না কোনোভাবেই; কারণ পাঠকের বহুযুগব্যাপী ব্যঞ্জনাবোধের সঙ্গে তা সংযুক্ত ও সাযুজ্যপূর্ণ। যেমন 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-তে অঙ্কিত দ্বৈপায়ন তাসের রাজ্য বা তাসরমণী, *লিপিকা*-র 'তোতাকাহিনী'-তে বর্ণিত তোতাপাখিটি, কিংবা 'কর্তার ভূত' গল্পে 'ভূতুড়ে জেলখানা', অথবা সমাজরূপ পেষণযন্ত্র বা উৎপাদনযন্ত্র হিসেবে উল্লিখিত ঘানি, *গল্পসল্প*-এর 'বড়ো খবর' শীর্ষক পরিচ্ছেদে পাল ও দাঁড়ের দ্বন্দ্ব, নৌকা, এমনকি নৌকার মাঝি অবধি, *সে*-তে শিবুনাথ শেয়ালের আখ্যান কিংবা দুইপ্রকার বাঘের বৃত্তান্ত— সবকিছুই এই পরিসরটিতে প্রকাশ করা চলে।

খ) রূপক যেখানে সটীক ব্যাখ্যাধর্মী: বহু ক্ষেত্রে হয়তো-বা সমকালীন পাঠকবৃত্তের বোধগম্যতার সীমারেখা-সংক্রান্ত সংশয়-দ্বিধার কারণেই, আমরা দেখি, লেখক তাঁর প্রযুক্ত রূপকের ব্যাখ্যাটিপ্পনী যোগ করতে উদ্যত হয়েছেন। পূর্বোক্ত কাঠঠোকরা ও কাদাখোঁচার রূপকটি যেমন, আদতে প্রবচনধর্মী লৌকিক, তবু সেখানে গল্পকথক তাঁর উদ্দেশ্যমূলকতা পরিহার করতে পারেননি। এমনকি শিবুনাথ শেয়ালের মতো একটি নিটোল রূপকের ক্ষেত্রেও সেটি যে 'আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি' তা তিনি পাঠককে *সে*-র মুখ দিয়ে সচেতন করিয়ে দিতে ভোলেননি। তবে এগুলি ন্যূনতম নমুনা যদিও, আরও নানা গুরুতর উপাত্তের দেখা আমরা পেয়ে যাই রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে। রূপকাতিশয়োক্তি সরলীকৃত হয়ে পড়েছে দেখি উত্তোলিত উপমায়। যেমন, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে 'শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘট' যে বৈদ্যনাথের জীবনদৃষ্টির তাৎক্ষণিক শূন্যতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক ভগ্নদশারই উপমান, তা লেখকের (author) নির্দেশমাফিক আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না; অথবা 'সমাপ্তি' গল্পের সূচনায় বর্ণিত আকাশ ও নদীর প্রফুল্লতা যে আসলে অপূর্বকৃষ্ণের মানস-পরিস্থিতিরই দ্যোতক, তাও লেখকের তৎপরতায় পরক্ষণেই আমরা উপলব্ধি করতে সফল হই।

গ) প্রচ্ছন্ন রূপক: উপরোক্ত দুই গোত্রের রূপকধর্মিতা ব্যতিরেকেও রবীন্দ্রনাথের আপাত যে বস্তুগত কাহিনিকথন (বিশেষত তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এর গল্পসমূহের ভেতর), সেখানেও আমরা দেখি নানান রূপকব্যঞ্জনাধর্মী বয়ান ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রয়েছে— যা সুপ্ত, যা নিঝুম প্রোথিত, পাঠকের বিনির্মাণপন্থী খননক্রিয়ায় স্বতন্ত্ররূপে অনুধাবনযোগ্য ও বিতর্কমূলক। বিশেষভাবে এই ধাঁচটিকেই আমরা বলতে চাইছি প্রচ্ছন্ন রূপক। অর্থাৎ আপাত একটি আভিধানিক আলাপনে, প্রতিনিধিত্বমূলক পরিসরের ভিতর, লুক্কায়িত কোনো রূপকভাষ্যের প্রবালদ্বীপ। বস্তুত রবীন্দ্রমানসের সাহিত্যরুচিগত যে বিশেষ দ্বান্দ্বিকতার কথা আমরা বলছিলাম, তার নিবিড় সুফল আকারে, পূর্বোক্ত দুই প্রবণতার সংঘাত-সমঝোতার ফসলরূপেই একপ্রকার, আমরা এই ঝোঁকটিকে অনুভব করছি, যা ভাবীকালের কথাসাহিত্যেও অন্যতম অনিবার্য নিয়ন্তা হিসেবে লীলাচরণ করছে। যেমন, 'দুরাশা' গল্পে যমুনার নির্জন খেয়াঘাটে কেশরলালের নিরালা জীর্ণ নৌকা অথবা 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে 'সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের' মধ্য দিয়ে চলা শশীভূষণের নৌকা, 'মহামায়া' গল্পে মন্দিরের 'অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট' কিংবা ভাঙা ঘাটের সোপানে নদীর জলের ছন্দোময় আঘাতের ধ্বনি, প্রতিকূল ঝড় কিংবা উড়ন্ত কাঁকর, 'নষ্টনীড়' গল্পে অমলের মশারির ওপর কারুকাজ রাখার বাসনা, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের প্রদীপ-নেভা অন্ধকার, অথবা আরও একটু বিতর্কিতভাবে 'সমাপ্তি' গল্পে মহাজনী ইঁটের পাঁজা বনাম কাদার পিচ্ছিলতা ও 'পণরক্ষা' গল্পের বাঁশঝাড়ের বর্ণনা প্রভৃতি এই গোত্রের দৃষ্টান্ত। এছাড়া এমনকি *সে* গ্রন্থে

মনুমেন্ট লেহনকে কেন্দ্র করে বিবাদ-বিসম্বাদের যে পরিবেশ, তা আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট হলেও, তাকেও আমরা প্রচ্ছন্ন রূপক হিসেবেই শনাক্ত করতে চাইছি।

ঘ) প্রত্নপ্রতীকের পুনর্গঠন: যেখানে একটি কোনো পরিচিত প্রতীকভাবনা, যেটিকে ভেঙেচুরে নতুন পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হচ্ছে, বিশেষরকম বিকল্পায়নের মধ্য দিয়ে তাকে নতুনতর তাৎপর্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন, *লিপিকা*-র 'সুয়োরানীর সাধ', 'রাজপুত্তুর', 'ভুল স্বর্গ', 'পরীর পরিচয়' প্রভৃতি গল্পে এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

এছাড়া উপরোক্ত এই চারটি শ্রেণীর অতিরিক্ত আরও একটি/দুটি খুচরো প্রবণতার কথা উল্লেখ করা যায়।—

ঙ) প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব: লেখকের *সে* শীর্ষক গ্রন্থটির 'গেছো বাবা' অংশটিকে এক্ষেত্রে আমরা নমুনা হিসেবে দাখিল করতে পারি। বস্তুত, প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব বলতে আমরা বলতে চাইছি সেই বিশেষ যুক্তিবিভ্রমের কথা— যেখানে কোনো বিশেষ ফলাফলের পূর্বপ্রান্তে প্রযুক্ত (অথবা নিম্নতলে নিযুক্ত) প্রধান বা প্রকৃত কারণটিকে শনাক্ত করতে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে, বা তাকে বলপূর্বক উপেক্ষা করে, অন্য কোনো ছদ্ম বা গৌণ কারণকে উপস্থাপন করা হয়। এখানেও, গেছো বাবার উপাখ্যানটিতে গাজন পালের চাকরি পাওয়ার ছদ্ম বা গৌণ কারণ হল তার উল্লিখিত দেবভক্তি (অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদিত ধান, এমনকি পাঁঠাও), এবং যে মূল কারণটুকু রয়েছে প্রচ্ছন্ন, তা হল: তার রাজভক্তি (উমেদারি বা চাটুকারিতা)। সেইসঙ্গে সামগ্রিকভাবেও, গেছো বাবার গোটা গল্পটিকেই আমরা এই একই শ্রেণির হেতুবাচক নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। ভেকুর ওই বিশেষ গামছা (~~শাল দোশালা~~) লাভের ঘোষিত কারণ হল গেছো বাবার অলৌকিক কৃপা (~~পার্থিব ক্রয়পদ্ধতি~~): এই ছদ্ম প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করেই ওই গামছা দেবত্বের বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

চ) বিমিশ্র বা অবর্গীকৃত ব্যঞ্জনা: এবং যথারীতি এসবের বাইরেও আরও কিছু উদাহরণ রয়ে যাচ্ছে, যেগুলিকে হয়তো উপরের কোনো গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত সেভাবে করা যাচ্ছে না, কিছু বিমূর্ততার বাস রয়ে যাচ্ছে, গোলাকার কোনো অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে না, অথবা একাধিক পরিকাঠামো উদ্ভটভাবে মিলেমিশে যাচ্ছে, সেগুলিকে কিঞ্চিৎ খাপছাড়াভাবে উত্থাপনের চেষ্টা করেছি, যদিচ কোনো নিটোল মীমাংসায় পৌঁছাতে পারিনি।

৩.৩ ভাবীকালের গল্পকাঠামোয় প্রচ্ছন্ন রূপকের সম্ভাবনাময় সম্ভার

প্রচ্ছন্ন রূপকের আরও বিচিত্র কুটিল প্রয়োগ-সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত দাখিল করতে গিয়ে আমাদের যারপরনাই বিব্রত ও বিভ্রান্ত হতে হয়েছে। 'কল্লোল-যুগ' বা আনুষঙ্গিক বা তৎপরবর্তী কথাসাহিত্যপুঞ্জের বিপুল তরঙ্গমালা থেকে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তুলে ধরার কাজ বাস্তবিকই মনে হয়েছে দুরূহ। সেক্ষেত্রে মূলত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখের কিছু কিছু গল্পকে আমরা খাপছাড়াভাবে বেছে নিয়েছি— আখ্যানের গহনতলে নিহিত নানান জটিল রূপক-নির্দেশকের বাচ্যাতিরিক্ত তাৎপর্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর জন্য; এবং এই গোত্রেরই আরও বিশেষতর উৎকর্ষ অনুধাবনের জন্য, সময়ের নিরিখে আরও কয়েক দশক ভাবীকালের দিকে ও ভূগোল-রাষ্ট্রের নিরিখে আরও কয়েক যোজন পূর্বপ্রান্তে সরে গিয়ে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাস ঘেঁটে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি অদৃশ্য অনুক্ত আপাত-সরল রূপক-নির্দেশকের সম্ভাবনাময় সম্ভার। বলা বাহুল্য, উপাত্ত হিসেবে আরও নানানবিধ পাঠকৃতির গহনে আমরা হয়তো-বা অবগাহন করতেও পারতাম, কিন্তু তাতে করে আমাদের সামগ্রিক সিদ্ধান্তের খুব-খানিক রদবদল হত বলে বা আমাদের পাঠপ্রত্যয়গত প্রধানতম প্রবণতার বিশেষ কিছু হেরফের হত বলে আমাদের মনে হয়নি।

এক্ষেত্রে প্রথমেই বলে নিতে চাই— পূর্বালোচিত 'প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব' গোত্রের নানারকম নমুনা, যথারীতি, পরবর্তীতেও পর্যাপ্ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস', 'দুঃশাসন', 'নক্রচরিত' প্রভৃতি গল্পে একটি বিশেষ চিহ্নের প্রয়োগ যেন বারবার ঘুরে-ফিরে আসে— পানের পিক বা পানের রস নানান প্রেক্ষিতে রক্তের বিভ্রান্তিকর বিকল্প হিসেবে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়; যা কোনো-না-কোনো ক্রূর আগ্রাসন বা হিংস্র ক্ষুধার্ত ক্ষমতাতান্ত্রিকতার বিপজ্জনক আবহকেই পুঞ্জীভূত করে তোলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে লেখকের পিঠোপিঠি পাঠকেরও প্রলম্বিত কিছু উদ্‌বেগ ও দুশ্চিন্তা যেন তাদের ভাবনাকে রক্তিমতার মূল কারণ (পানের পিক) থেকে সরিয়ে অন্য একটি অনুচ্চারিত অস্বস্তিকর সম্ভাব্য কারণের (রক্ত) দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয়তো' গল্পে যেমন ফুলশয্যার রাতে মাধুরীর-ফেরত-দেওয়া পুঁটলিতে ফুলের গয়নার ফুলগুলি 'চটকানো' থাকার মূল কারণ থাকে গৌণ কারণের তলায় প্রচ্ছন্ন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিতেও এইজাতীয় উদাহরণ যথেষ্ট।

পাশাপাশি প্রত্নপ্রতীকের পুনর্গঠনেরও বহু দৃষ্টান্ত আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পে-আখ্যানে লক্ষ করতে পারি। যেমন— 'দুঃশাসন' গল্পে দুঃশাসনের প্রতিস্থাপক হয়ে উঠছে তৎকালীন বাংলার মুনাফালোভী মজুতদার কিংবা দালালগোষ্ঠী, আর দ্রৌপদীর বিকল্প হয়ে উঠছে বাংলার সামগ্রিক সমাজচিত্র। অথবা 'পুষ্করা' গল্পে ডোমপাড়ার পাগলিই যেন

হয়ে পড়ছে শ্মশানকালীর ট্র্যাজিক প্রতিমূর্তি; এমনকি 'মারী ও মড়কের সমস্ত বিষ' চিরকাল 'নিঃশেষে' পান করে নেওয়ার জন্য নীলকণ্ঠের সঙ্গেও উপমিত হচ্ছে সমাজের নিচুতলার মানুষজন। আবার একটু পৃথকভাবে, 'হাড়' গল্পে রায়বাহাদুরের অধিকাংশ কাহিনিবৃত্তান্তেরই একপ্রকার বিনির্মিত ভিন্ন ব্যাখ্যা (deconstructed interpretation) তৈরি করছেন কথক, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির নিরিখে— স্বগতোক্তির ভেতর বিষণ্ণ শ্লেষবাক্যে 'যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস' কিংবা হাড়ের অলৌকিক ক্ষমতা-সংক্রান্ত মিথগুলিকে ভেঙেচুরে বাংলার তথা কলকাতার দুর্ভিক্ষকালীন দুরবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইছেন নিরন্তর।

তবুও, সর্বোপরি, প্রচ্ছন্ন রূপকের চমৎকারিত্বই আখ্যানের পাঠ-প্রকল্পে আরও নিগূঢ়, আরও আকর্ষণীয় মাত্রা যোগ করে দেয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস', 'হাড়', 'টোপ', 'নক্রচরিত', 'সৈনিক', 'দুঃশাসন', 'বন-জ্যোৎস্না' প্রভৃতি গল্পে প্রায়শই আমরা অনুভব করতে পারি, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতময় নানান রূপক অথবা নির্দেশক ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। যেমন— 'বীতংস' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র সুন্দরলাল একপ্রকার ভয়-মেশানো দৈব সম্ভ্রম-জাগানো সম্মোহন ঝুলিয়ে রাখতে সমর্থ হয় নিজের উপস্থিতি জুড়ে, এবং আমরা দেখি, তার পায়ের তলায় 'শুকনো শালের পাতা' যখন মড়মড় করে, তখন 'ঝড়ু মোড়লের সারা গা ছমছম করে' ওঠে; বস্তুত 'পিশাচসিদ্ধ' সুন্দরলালের পায়ের তলায় এইরূপ শুকনো শালপাতার 'মড় মড়' শব্দ যথারীতি অনুঘটক বা উদ্দীপন-বিভাব (অর্থাৎ পরোক্ষভাবে, হেতুবাচক নির্দেশক) হিসেবে যেমন একটি নিঝুম রহস্যময়তার আবহকে পুঞ্জীভূত করে তোলে, আবার বিশেষভাবে রূপকত্বের খোঁজ করতে গিয়েও উঠে আসে ক্রমান্বয়িক জিজ্ঞাসাজাল: যেমন শালগাছের পাতা 'শুকনো' কেন? কেন তা 'পায়ের তলায় মড় মড় করছে'? তা কি কোনোরকম দুর্বলতাকেই দ্যোতিত করতে চায়? কার দুর্বলতা? তা কি আসলে ঝড়ু মোড়লের সাহস ও আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠতার অভাবকেই নির্দেশ করছে না? সুতরাং এই পথে পাঠের নিবিড় তাৎপর্য আরও ব্যাকুল বৈচিত্র্যময় কিছু অনুভাষ্যকেও ধারণ করে থাকে। কিংবা 'কৃষ্ণচূড়ার একরাশ রাঙা পাপড়ি' সেই পরিসরে 'ঝুর ঝুর করে' ঝরে পড়ার মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ সাঁওতালদের স্বাধীন প্রাণবন্ত জীবনের বিনষ্টি বা অধঃপতনের রূপক-দ্যোতনা লুকিয়ে থাকে। 'বন-জ্যোৎস্না' গল্পে শালগাছের রূপকতত্ত্বও অনুরূপ, অথচ প্রতিস্পর্ধী। আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে তাঁর 'মধুবন্তী' গল্পটিতে যেমন, আর্থ-সামাজিকভাবে পৃথক দুই কলোনির মাঝখান দিয়ে ছুটে-চলা রেললাইন যেন দেশভাগজনিত বহুমাত্রিক বিভাজনরেখা আকারেই দ্যোতিত হয়ে ওঠে, আর অন্ধকারে 'ভাঙা বাঁশের পুল' যেন হয়ে ওঠে 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' (পরিভাষা: আখাতারুজ্জামান ইলিয়াস); এছাড়া 'হোগলা বনের তলায় মড়ার হাড়' কিংবা 'শেয়ালের কোরাস' যাবতীয় কিছু এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট নিবিড় বেদনাময় রূপকের বাস্তবতাকেই বিমূর্ত করে তোলে। অথবা তাঁর 'ইতিহাস'

গল্পে যেমন, কেটলিতে ফুটন্ত জল কিংবা 'স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ' অনুরূপ রূপকত্বে বহির্বিশ্বের বিশেষ ভাব-পরিস্থিতিকে ব্যঞ্জিত করছে, আবার রবীন্দ্রগল্পের পূর্বালোচিত প্রবণতাগুলিকে মেনে ব্যাখ্যাধর্মিতাও বজায় রাখা হয়েছে উপমেয় হিসেবে 'উত্তেজিত ভারতবর্ষের প্রাণ' কথাটির উল্লেখে; প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'স্টোভ' গল্পেও যেমন বাসন্তীর বিস্ফোরক অবদমিত ক্ষোভ সূচিত হচ্ছে একই পদ্ধতিতে, যদিও তার টীকা-টিপ্পনীটুকু এক্ষেত্রে অনুচ্চারিতই থাকছে; অথবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পতঙ্গ' গল্পেও স্টোভের ওপর বসানো কেটলিতে গরম জল বা জলের শব্দ যেন একইসাথে নায়কের যৌন প্রক্ষোভ আর বাহ্য পরিস্থিতির প্রগাঢ় উদ্‌বেগ ও উত্তেজনাকেই রূপকান্বিত করে (এখানেও পূর্বকথিত রাবীন্দ্রিক দ্বিধার দ্বারা চালিত লেখক এই উপমানটির একপ্রকার ব্যাখ্যাও উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন)। এছাড়া তাঁর 'সমুদ্র' গল্পে নায়কের স্ত্রী-র চিরুনি ও চুলের কাঁটার খোঁজ-সংক্রান্ত ভাববস্তু, 'নদী ও নারী' গল্পে ছই-নাড়ানো বাতি-কাঁপানো বা নৌকা-দুলিয়ে-দেওয়া 'দমকা' বাতাসের প্রসঙ্গ, 'তারিণীর বাড়ি-বদল' গল্পে বাড়ির বৃহত্তর ব্যঞ্জনা, 'জ্বালা' গল্পে শানওয়ালার 'ধারালো বঁটির পেটে' পিন্টুরানির আঙুল ঘষতে গিয়ে রক্তারক্তি বাঁধানোর সারমর্ম কিংবা 'গিরগিটি' গল্পের বিক্ষিপ্ত বিবিধ জটিল যৌনরূপক প্রভৃতি, পাঠপ্রক্রিয়ার ভেতর নানান ধাঁচের উজ্জ্বল নলকূপ হিসেবে আবিষ্কৃত হতে থাকে।

সুতরাং, গল্প-উপন্যাসের পাঠ-মীমাংসা এই পদ্ধতিতে আরও প্রলুব্ধকর ও প্রাতিস্বিক হয়ে ওঠে, যা সার্বিক সমালোচনা-দৃষ্টিকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম। যেমন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পটিকে হাসান আজিজুল হক প্রাথমিকভাবে মনে করেছিলেন একটি অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিবাদী আত্মজৈবনিক লেখা (হক: ১৯৮১: ৭৯)। কিন্তু গল্পটির চিহ্নবিশ্লেষণ করলে সেটি একটি আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক লেখা হয়ে দাঁড়ায়, সরাসরি কোনো মতাদর্শের প্রচার কিংবা সরাসরি কোনো রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ছাড়াই। এছাড়াও আরও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল যেমন তাঁর 'যোগাযোগ' গল্পটি। গল্পটিকে 'নিটোল বাৎসল্যের গল্প' (সাহা: ২০০৬: ১৫) হিসাবে দেখেছেন কেউ কেউ। কিন্তু গল্পটির চিহ্নবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা অন্য এক বিষাদময়তার মুখোমুখি হই। তিনটি বাৎসল্য-সম্পর্ক আছে এই গল্পে: মূল খোকন-রোকেয়ার সম্পর্ক, পাশাপাশি রেফারেন্স হিসাবে রোকেয়া-রোকেয়ার মা এবং রোকেয়া-সোলায়মান আলির সম্পর্ক। এক স্বপ্নবিভ্রমের মধ্যে রোকেয়া একটি মেয়েকে দেখে তার কথায় নিজের মৃত মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলে, তারপর আর কাউকে দেখতে পায় না। রোকেয়ার মা এভাবেই তার সরল স্নেহ ও সহানুভূতি নিয়েও হারিয়ে যায়, রোকেয়ার কষ্টকে ছুঁতে পারে না। যেমন পারে না রোকেয়ার বাবা সোলায়মান আলিও। ছেলেবেলায় 'ফুটন্ত পায়ার ঝোল থেকে গরম ধোঁয়া বেরিয়ে' রোকেয়ার কণ্ঠার হাড়ের নিচে অনেকটা জায়গা ঝলসে গেলে সোলায়মান আলির শত আদরে শত সান্ত্বনাতেও রোকেয়ার 'কান্না' থামে না, এমনকি পরিণত

বয়সেও সোলায়মান আলির সান্ত্বনায় রোকেয়ার দুশ্চিন্তা কমে না। সুতরাং পিতা-মাতা তাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভরসার হাত নিয়েও সন্তানের সব কষ্ট লাঘব করতে পারে না। আসলে খোকন-রোকেয়ার সম্পর্কও একই ভাবসূত্রে আবদ্ধ। যেখানে খোকনকে ঘিরে রুগ্ন দমবন্ধ-করা সময়বাস্তবতার ছবি। এবং রোকেয়াকে সেসব কিছুই ছুঁতে পারে না বলে, সময়বাস্তবতাকে অতিক্রম করে খোকনের কাছে পৌঁছানো তাই রোকেয়ার আর হয়ে ওঠে না। খোকনের শরীরে ১০৪° জ্বর পুরু কম্বলের মতো বিরাজ করে, তা ভেদ করে রোকেয়ার আঙুল খোকনের কষ্টের কাছে পৌঁছতে পারে না। পুরু কম্বলের মতো '১০৪° জ্বর' এখানে মা ও সন্তানের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্নতার দ্যোতক। কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ হল— 'বিছানা'র ওপর অসুস্থ খোকন, একটি 'টুল'-এর ওপর রোকেয়া, মাঝখানে 'সরু ঠাণ্ডা মেঝে'। 'বিছানা' এবং 'টুল' পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই আসন, যা খোকন ও রোকেয়ার দুই বিচ্ছিন্ন জগৎ, বিচ্ছিন্ন অবস্থানের সূচক— উভয়ের মাঝে 'সরু ঠাণ্ডা মেঝে' সুনিশ্চিতভাবে সংকীর্ণ শীতল বিচ্ছিন্নতাকেই চিহ্নায়িত করে। অথচ এই রূপক কিংবা নির্দেশকগুলি গল্পের স্বাভাবিক ঘটনা, ছবি ও বর্ণনার সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে আলাদা করে সেগুলিকে বিশেষ কোনো চিহ্নায়ক হিসাবে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাস থেকে এইরূপ আরও অজস্র অনবদ্য উপাদান তুলে এনে হাজির করা যায়, যেখানে এইরূপ ছোটো ছোটো চিহ্নায়কের উপস্থিতি, আমরা দেখি, এক বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্য নির্মাণ করে। ছোটোবড়ো নানা উপাদান, দৈনন্দিন অভ্যাস, সমস্ত কিছুই এক অখণ্ড ব্যঞ্জনার দিকে ধাবমান। আমরা দেখেছি, ইজিচেয়ার মশারি বালিশ বাথরুম চিলেকোঠা কিংবা কারো চুল আঁচড়ানো থেকে বিছানায় পেচ্ছাপ করা— সব কিছুই সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা পালনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কেবল নিরাপদ উচ্চশ্রেণি ও আপোষপ্রিয় মধ্যবিত্তদেরই দেখা যায় ইজিচেয়ারে বসে থাকতে, আবার তার বিপরীতে নিম্নজীবী শ্রেণির প্রতিবাদী চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় ছেলেবেলা থেকেই বিছানায় পেচ্ছাপ করার স্বভাব। সুতরাং বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে কার কী ভূমিকা বা কার কী অবস্থান হতে পারে তা ওইটুকুতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। মতাদর্শগত কত না গহন বক্তব্য, আমরা দেখি, উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যাধর্মিতার থেকে বিমুখ, প্রাত্যহিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণসমূহকে অবলম্বন করেই নিজেদের বিকশিত করতে চাইছে। এই বিষয়টিই ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসে প্রায় এক তত্ত্বের আকার নিয়েছে, যেখানে বস্তুপৃথিবীর বীক্ষণময় বুনটজাল বয়ানের মজ্জাকাঠামোগত রক্তপ্রবাহের সূত্রে লগ্ন হয়ে আছে।

৩.৪ বয়ানের কুটিল বিক্ষোভ ও ব্যঞ্জনার ক্রূর বিমিশ্রতা: গল্পহীনের গল্পকুহক

বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় আমরা দেখেছি ষাট-সত্তরের দশক নাগাদ বা তারও আগে থেকে প্রচলিত বাচনভঙ্গির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে একপ্রকার বিদ্রোহের আভাস ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল, যা পরবর্তী দশকগুলিতে আরও পরিপক্কতা লাভ করেছে বলা যায়। এই ঘনায়মান অসন্তোষ ও রূপান্তরকামিতার প্রেক্ষাপটে লক্ষ করা যায়— কেউ নতুন রীতিতে গল্প লিখতে চেয়েছেন, কেউ 'অ্যান্টি'গল্পের অবতারণা করেছেন, কেউ গল্পসন্ধানীদের গুলি করে মারার কথা বলেছেন, কেউ চেয়েছেন 'ব্রয়লার' শিল্পসাহিত্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠতার সঙ্গে লিখে যেতে, কেউ-বা আখ্যানকাঠামোকে একটি 'প্রপঞ্চময়' হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন; সুতরাং এপার-বাংলার কথাসাহিত্য-চর্চার মধ্যে ওইসময় থেকে প্রায় অনেকেই সচেতনভাবে প্রথাবিরোধী বা প্রতিষ্ঠানবিমুখ কিছু-না-কিছু প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখছেন। এবং তা করতে গিয়ে শুধু যে Ideology বা ভাবাদর্শের দিক থেকে প্রচলিত সমাজচিন্তার প্রতিকূল কোনো পৃথক অবস্থান বজায় রাখতে হচ্ছে তা-ই নয়, ভাষা ও ভঙ্গিমার দিক থেকেও প্রতিস্পর্ধী কিছু-না-কিছু ভাবতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেই প্রকল্পনাকে সত্যি করতেই হয়তো, তাঁরা গল্পসুতোর বেড়াজাল ছিঁড়ে কিংবা কাহিনির মরীচিকায় মজে না গিয়ে, রূপকের ভাষাকে প্রায়শই বলিষ্ঠ হাতে ব্যবহার করেছেন, কিংবা ব্যঞ্জনার বিমূর্ত আদল ফুটিয়ে তুলেছেন। টেকনিক হিসেবে জাদুবাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা অনেক বেশি প্রাঞ্জল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে এবং যাচ্ছে। এছাড়াও আঙ্গিকগত অন্যান্য আরও বহুবিচিত্র ভাঙচুরের প্রবণতাও লক্ষ করা যাচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি বিমল করের 'ইঁদুর', 'সোপান', 'কাচঘর' প্রভৃতি গল্পের কথা বলতে পারি। এগুলিও মূলত প্রচ্ছন্ন রূপকের ঘরানাতেই পড়ে, তবে এখানে রীতির 'নতুনত্ব' বুঝি এই যে, এখানে একটিই প্রচ্ছন্ন রূপক একটিই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বা theme আকারে অবস্থান করছে। হাংরি গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক বাসুদেব দাশগুপ্তের 'দূরবীন' গল্পে দূরবীনের মধ্যে সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির দ্যোতনা ও কথকের জ্বলন্ত রাক্ষস হয়ে-ওঠার মধ্য দিয়ে তার প্রতিবাদী সত্তার তীব্রতার রূপকল্প প্রকাশিত হয়, 'বমনরহস্য' গল্পে নারীমাংসের পসার বা পাত্রপাত্রীর উল্টো হয়ে নগ্ন ছাল-ছাড়ানো অবস্থায় ঝুলে বিবমিষাউদ্রেককারী ছবিটি বর্তমান সমাজে মানুষের দুর্দশাকেই চিহ্নিত করে। আবার তাঁর সুপরিচিত 'রন্ধনশালা' গল্পে স্বপ্নবাস্তবতার সুচারু প্রয়োগ (প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' অথবা মার্কেজের 'বিশাল ডানাওয়ালা থুথুরে বুড়োর গল্প'টিতেও যেমন) আমাদের ভাবনাকে আরও গহন পরিসরে নিয়ে যায়। জাদুবাস্তব আসলে যেমন রূপকের বাস্তবতা; আমাদের মতে পরাবাস্তব বা

স্বপ্নবাস্তবও আসলে গভীর প্রকৃষ্ট গোছের এক প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব তথা হেতুবাচক নির্দেশকের উদাহরণ, যার ব্যাখ্যা লুকিয়ে পাঠকৃতির ভেতরে এবং বাইরে। 'শাস্ত্রবিরোধী' গল্পকার সুব্রত সেনগুপ্তের 'জামা' গল্পে দেখা যায় নায়কের বাহ্যপরিচিতির দ্যোতক হিসেবে একটি সুন্দর জামা কীভাবে ঘুমের পরিবেশে তার শরীর ও চেতনাকে বেষ্টন করে ক্রমশ গ্রাস করে নিতে থাকে। নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখা 'মাথা নেই তো হয়েছে কি' গল্পে মাথাহীন বেশ্যা তার 'ক্যাসেট ক্যাসেট হাসি'র যান্ত্রিকতা ও আকর্ষণীয় শরীরের সম্মোহন নিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের মেধা-মননবর্জিত ক্ষতিকারক সংস্কৃতির রূপক হয়ে দেখা দেয়। কিংবা '৪+১' গল্পটিতে নামপরিচয়হীন একটি শবদেহ যেন-বা মৃত মূল্যবোধ বা স্বপ্ন-আশা প্রভৃতির রূপক হিসেবে উপস্থাপিত হয় (প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসে নায়কের কাঁধে বাঁকাবুড়ির শবও কিছুটা অনুরূপ তাৎপর্যবাহী)। এছাড়া তাঁর ফ্যাতাড়ু চরিত্রের ওড়ার ক্ষমতাও দ্বিবিধ অর্থে ব্যঞ্জনার ভাষ্য জ্বালিয়ে রাখে। অথবা তাঁর *কাঙাল মালসাট* উপন্যাসে চোক্তার-চরিত্র ভদি যখন গোপন ও বিকল্প টেলিফোন-যোগাযোগ স্থাপন করে, তখন সেই টেলিফোনে তার গলার স্বরের অনুনাসিকতা প্রতিসরণমূলক কার্যকারণতত্ত্ব অনুযায়ী ভূতুড়ে ধ্বনির বিভ্রম জাগায়, যা তার উপেক্ষিত জীবন ও সমান্তরাল বেঁচে-থাকার বেদনাকে সূচিত করে; আর *লুব্ধক* উপন্যাসের পিঁজরাপোল ও কুকুরের রূপকভাষ্য তো আমাদের জানাই আছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পেও বর্ণনাতিরিক্ত ভাষার শক্তি সুষমামণ্ডিত হয়ে রয়েছে। তাঁর 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পের সেই কিম্ভূত কাক কিংবা 'মাংসখেকো ঘোড়া' গল্পে বিজ্ঞাপনের ফ্রেম থেকে লাফিয়ে নেমে এসে একজন ঘুমন্ত শ্রমিকের ডানহাত চিবিয়ে-খাওয়া অলৌকিক লাল ঘোড়াটি যেভাবে অতিপুঁজিবাদী পণ্যসংস্কৃতির সম্মোহক আগ্রাসী চরিত্রের রূপক হয়ে ওঠে, বা 'একটি ইস্পাত-পাখি' গল্পে নানারকম লোহা একছাঁচে গলিয়ে পিণ্ড বানিয়ে ফেলার প্রযুক্তি ও সেই ইস্পাতের বানানো বৈচিত্রহীন পাখিগুলির ওড়ার অক্ষমতা যেভাবে পণ্যায়িত সমাজ-সভ্যতায় মানুষের দুরবস্থাকেই দ্যোতিত করে, অথবা 'শহরে বৃষ্টি হয়' গল্পে নিয়ন আলোর রঙে 'মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে' উল্টে মেঘ হয়ে ঝুলে-থাকা শহর এবং জলের বদলে ভোগ্যপণ্যের যান্ত্রিক বৃষ্টি যেভাবে শহরটির ইতিহাসবিচ্ছিন্ন ভোগবাদের ব্যঞ্জনা বহন করে, কিংবা 'কান্নাদানশিবির' গল্পে শোষিত মানুষদের কান্নাদানের গভীর সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য পাঠকহৃদয়কে ব্যথিত করে তোলে—তাতে আখ্যানের নিহিত বেদনা আরও নিবিড় হয়ে ধরা দেয়। সুবিমল মিশ্রের গল্পে আমরা দেখি হারাণ মাঝির বিধবা বউয়ের মড়া সর্বত্র দৃশ্যমান হয়ে যেভাবে সোনার গান্ধীমূর্তির নাগাল পাওয়াকে ব্যাহত করে, তাতে শোষিত শ্রমজীবী মানুষদের গলিত দুর্গন্ধময় জীবনের অভিশাপ কীভাবে বুর্জোয়া মূর্তিপূজার সংস্কৃতিকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে তোলে, তা-ই প্রকাশ পায়। এছাড়া ময়দানে টাকার গাছ কিংবা টাকা ডবল করার ম্যাজিক যেভাবে প্রতিসরণমূলক

কার্যকারণতত্ত্বের মাধ্যমে গভীর সামাজিক দুর্নীতির ইশারাকেই ফুটিয়ে তোলে, কোথাও কথকের বিলি-করা চকোলেট যেভাবে অহিংসার বাণীর ব্যঙ্গাত্মক রূপক হয়ে ওঠে, কোথাও আবার কথকের হৃৎপিণ্ড খুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে যেভাবে সমাজে হৃদয়হীনতার চর্চাই অনিবার্য হয়ে ওঠে, তাতে সুবিমল মিশ্রের বয়ানেও সেই প্রতিস্পর্ধী গভীরতা অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে।

উপসংহার

সুতরাং শেষাবধি আমরা দেখলাম যে, চিহ্নের অমিয় সম্ভাবনা আমাদের দৈনন্দিন যাপন ও যোগাযোগের ভিতরেই প্রতিনিয়ত জন্মাচ্ছে আবার প্রতিনিয়ত মৃত্যুমুখে পতিতও হচ্ছে। বস্তুত চিহ্নের ধর্মই এই, কিন্তু এই নিরন্তর সৃষ্টি ও ভাঙনের মধ্য দিয়েই ভাষা বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে সাহিত্যও। একই চাঁদ কখনো প্রেমিকের চোখে হয়ে উঠছে প্রিয়ামুখ, কখনো ক্ষুধিতের চোখে হয়ে উঠছে 'ঝলসানো রুটি'; কিন্তু চাঁদ শুধু চাঁদ হয়েই থাকলে সে মরে যেত। সেই কোন্ প্রাচীনকালে মানুষ প্রতীক ভেঙে রূপকের জন্ম দিয়েছে, পশুকথা ভেঙে নীতিকথা, আবার কখনো মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই রূপকের বিমূর্ততা মুছে ফেলে নিটোল ভাবমূর্তি গড়ে নিতে চেয়েছে, রূপকের বদলে এসেছে বিশেষ প্রতিনিধির দল, রূপকথাকে ক্রমশ কোণঠাসা করে রাজত্ব শুরু করেছে রোমান্স, আবার তাকেও দেখতে দেখতে সরে যেতে হয়েছে, জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে আধুনিক উপন্যাসের জন্য, এইভাবে নীতিকথার ঘাঁটিও দখল করে নিয়ে আধুনিক ছোটোগল্প। আবার প্রতিনিধিবর্গকেও পড়তে হল দ্বান্দ্বিকতায়, রূপকের হারানো জমি কিন্তু-কিন্তু করে কিছু অন্তত ছাড়তেই হল। এদিকে রূপকচিহ্নেরাও এখানে-সেখানে ঘাড় গুঁজে উদ্‌বাস্তুর মতো টিকে গেল প্রচ্ছন্ন চেহারায়। ধীরে ধীরে আখ্যানের আঙিনায় হৃত সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য আজও তারা মুখিয়ে রয়েছে প্রত্যাশায়, প্রলোভনে। কার্যত, জীবন যত বেশি বৈচিত্র্যের দিকে ঝুঁকতে থাকবে, দ্বিবাচনিক সম্পর্কগুলি হতে থাকবে ক্রমশ জটিল, ততই প্রাত্যহিক বয়ানে নিবিড় ব্যঞ্জনাময়তার প্রয়োজন হবে; নিছক একমাত্রিক ঘটনাবৃত্তান্তে আর মনন তৃপ্ত হবে না, বস্তুত কোনোদিনই হয়নি, জীবনের ভাষা রূপকধর্মিতাকে অবলম্বন করে চিরকালই বেঁচে আছে। আর তার সাথে রয়েছে জটিল অন্তঃসলিলা নির্দেশকের নিবিড়তম চলাফেরাও।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান: *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬), কলকাতা: প্রতিভাস, ১৯৯৩

_____: *রচনাসমগ্র ১*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯

কর, বিমল: *বাছাই গল্প*, কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৮৭ ব.

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ: *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (একাদশ খণ্ড), (সম্পা.) আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৪ ব.

_____: *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৩৬১ ব.

গুপ্ত, জগদীশ: *জগদীশ গুপ্তের গল্প*, (সম্পা.) সুবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা: দে'জ, ১৯৯৬

চট্টোপাধ্যায়, সাধন: *গল্প ৫০*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০০৯

দাশগুপ্ত, বাসুদেব: *রচনাসমগ্র ১*, (সম্পা.) অপূর্ব সাহা, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২৩

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০৫

_____: *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (ত্রয়োদশ খণ্ড), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৬ ব.

_____: *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২১ ব.

বসু, নিতাই(সম্পা.): *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, কলকাতা: দে'জ, ২০১১

বসু, শেখর (সম্পা.): *শাস্ত্রবিরোধী গল্প*, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১০

ভট্টাচার্য, নবারুণ: *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা: দে'জ, ২০০৬

মিশ্র, সুবিমল: *বইসংগ্রহ ১*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১২

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ: *কঙ্কাবতী* (১৮৯২), কলকাতা: সুজন, ২০০৯

_____: *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী* (অখণ্ড সংস্করণ), (সম্পা.) প্রফুল্ল কুমার পাত্র, কলকাতা: পাত্র'জ পাবলিকেশন, ১৯৯৫

সেন, সব্যসাচী (সম্পা.): *হাংরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ*, কলকাতা: দে'জ, ২০১৫

সহায়ক গ্রন্থ:

বিদেশি:

Barthes, Roland. *Sade/Fourier/Loyola* (1971). Richard Miller (trans.). London: Cape, 1977

_____: *S/Z* (1970), Richard Miller, Blackwell, Oxford, 1990

Baudrillard, Jean. *The Mirror of Production* (1973). St. Louis: Telos, 1975

Bullock, Alan & Stephen Trombley (ed.). *The New Fontana Dictionary of Modern Thought* (3rd ed.). London: HarperCollins, 1999

Chandler, Daniel. *Semiotics: The basic*. London: Routledge, 2002

Ivor A. Richards. *The Meaning of Meaning*. Kegan paul (ed.). London: Routledge, 1923

Leach, Mac Edward. *Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend*. Newyork: Funk & Wagnalls Co., 1949

Noth, Winfried. *Handbook of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press, 1990

Ogden, Charles K (1930). *Basic English* (9th edn.). London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. London: Routledge, 1944

Peirce, Charles Sanders. *Collected Writings* (8 vols) (ed. Charles Hartshorne, Paul Weiss and Arther W. Burks). Cambridge: Harvard University Press, 1931/58

Saussure, de Ferdinand (1916). *Course in General Linguistics* (Trans. Roy Harris). London: Duckworth, 1983

Thompson, Stith. *Motif-Index fo Folk-Literature*. Bloomington: Indiana, 1955-58

বাংলা:

কোসাম্বি, দামোদর ধর্মানন্দ: *ভারত-ইতিহাস চর্চার ভূমিকা,* (অনুবাদ: গৌতম মিত্র), কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০২

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ: *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (নবম খণ্ড), কলকাতা: ১৩৯২ ব.

_____: *সাহিত্যে ছোটগল্প,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৫ ব.

গোস্বামী, রূপ: *উজ্জ্বলনীলমণি,* (সম্পা.) হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা: ভারতী, ১৩৭২ ব.

ঘোষ, তপোব্রত: *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ,* কলকাতা: দে'জ, ২০১৮

চক্রবর্তী, শ্যামাপদ: *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*, কলকাতা: কৃতাঞ্জলি (প্রযত্নে: প্রজ্ঞাবিকাশ), ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ)

চৌধুরী, সুজিৎ: *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০১৬

দাশগুপ্ত, সুধীর কুমার: *কাব্যালোক*, কলকাতা: দে'জ, ১৯৯৮

দাশ, জীবনানন্দ: *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা: নাভানা, ১৯৫৪

দাশ, রণজিৎ: *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা: দে'জ, ২০০২

বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাণ: *মাংসাশী মেধার ট্রাপিজ*, কলকাতা: ছোঁয়া, ২০১৩

বিশ্বাস, অচিন্ত্য: *কঙ্কাবতী: বাস্তব ও স্বপ্নের নকশিকাঁথা*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২

ভট্টাচার্য, তপোধীর: *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৯৭), কলকাতা: দে'জ, ২০১৬

_____: *বাখতিন*, কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০০৯

_____: *বাখতিন: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬

_____: *রোলাঁ বার্ত, তাঁর পাঠকৃতি* (১৯৯৭), কলকাতা: দে'জ, ২০১৩

ভট্টাচার্য, দেবীপদ: *উপন্যাসের কথা*, কলকাতা: দে'জ, ২০০৩

মজুমদার, জহর সেন: *উপন্যাসের ঘরবাড়ি*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি: *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১২

_____: *লোককথার লিখিত ঐতিহ্য*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৯

মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র: *চিহ্নতত্ত্ব বা সেমিয়োলজি: সস্যুর থেকে দেরিদা*, কলকাতা: তবুও প্রয়াস, ২০২১

সাহা, পৃথ্বীশ: *পাঠে-পুনর্পাঠে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, কলকাতা: এখন মুক্তাক্ষর, ২০০৬

হক, হাসান আজিজুল: *কথাসাহিত্যের কথকতা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮১

হালদার, নির্মল: *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা: দে'জ, ২০০০

হোসেন, পারভেজ ও ফয়েজ আলম (সম্পা.): *জ্যাক দেরিদা: পাঠ ও বিবেচনা*, ঢাকা: সংবেদ, ২০০৬